সু প্রি য় রা য়

মুখোমুখি কবীর সুমন

সুপ্রিয়: জুলাই, ২০১৪-এর কবীর সুমনের একটা গড়পড়তা দিন কেমন?

সুমন : খুব সকাল থেকে শুরু। ভোর চারটের সময় আমার ঘুম ভেঙে যায়, একটু শুয়ে থেকে পাঁচটায় উঠে পড়ি। পৌনে ছ'টায় আমি **fully active**। প্রথমে ১৫-২০ মিনিট একটু হেঁটে আসি, বেশি হাঁটতে পারি না, আমার আর্থ্রাইটিস আছে, ব্যথা শুরু হয়ে যায়। তার পর ঘণ্টাখানেক গলার একটা এক্সারসাইজ করি। এরপর হাতের ব্যায়াম করি। আমার হাত কাঁপে, কয়েক বছর হল এটা শুরু হয়েছে। রাবারের কিছু সরঞ্জাম দিয়ে আমি ওই ব্যায়ামটা করি। দশ আঙুলের ব্যায়াম। তারপর আমি পড়তে বসি, অনেকদিন ধরেই তো সময় পাইনি। এখন খুব সিরিয়াসলি পড়াশোনাটা করি। এর পর আমি রেওয়াজ করতে বসি। এই রেওয়াজটা হয় ভারতীয় রাগসংগীতে। খেয়াল আঙ্গিকেই ওই রেওয়াজটা করি। তবলায় বিলম্বিত, একতাল কিংবা ঝুমরা একটা ঠেকা ধরে খুবই বিলম্বিত লয়ে বা মধ্য লয়ে রেওয়াজ করি। আগে দুপুরের দিকে ঘুমোতাম, এখন খাওয়ার অভ্যেস পালটে ফেলেছি, ভাত খাই না, তাই ঘুম আসে না। ওই সময়টাতে রেওয়াজ করি, আবার বিকেলে রেওয়াজ করি। সন্ধেতেও করি। আর লেখালিখির কাজ থাকলে সেটা সকালেই করি। গান লিখি সকালে, গলার এক্সারসাইজ করতে করতেই। এখনও লিখি। তবে খেয়াল রাখতে হয় রিপিটেশন হচ্ছে কিনা। আড্ডা বন্ধ। এক সময় আমি খুবই আড্ডাবাজ ছিলাম, বন্ধুবান্ধবের আনাগোনা প্রায় লেগেই থাকত। এখন বন্ধ। আমার সঙ্গে

দেখা করা প্রায় অসম্ভব! একটা জিনিস এখন আমার ভাবনায় আসে। সেটা হচ্ছে আমার সময়ের। আর কত বছর থাকি। আমার বাবা-জ্যাঠারা আশি একাশি বছর বেঁচেছেন। আমি যদি অতদিনও বাঁচি, তাও এখন আমার পঁয়ষট্টি পেরিয়ে গেছে এখন আর অত সক্রিয় থাকতে পারব না। ফলে আমি রোদ্দুর থাকতে থাকতে কিছু খড় শুকিয়ে নিতে চাই। বাজনা আমার প্রিয় জিনিস। অনেকরকম বাজনা যন্ত্রের আওয়াজ নিয়ে, ধ্বনি নিয়ে, আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি—এটা আমার নেশা। এর জন্য আমার অনেক খরচ হয়। ফলে ধ্বনি-বাজনা মিউজিক—এসব নিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমি কত বছর বাঁচব, সক্রিয় থাকব? ফলে বাকি আর অন্য কিছুতে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না।

সু : আপনি যে সকালে গলার এক্সারসাইজ করার কথা বললেন, সেটা কী ধরনের?

সুমন : এটা একটা আমেরিকান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। আমি নয়ের দশকে আমেরিকা গিয়েছিলাম, এটা তখন একটা দোকানে কিনেছিলাম। এটা ওখানকার একটা অপেরা চিক রক গান। অপেরা শিল্পীর মতো তাদের ক্ষমতা। তাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। এটার জন্য একটা পিয়ানো বা হারমোনিয়াম লাগে। পিয়ানো হলেই সবচেয়ে ভালো। মন্দ্র-অতিমন্দ্র সপ্তক থেকে শুরু হয়ে যতটা পারা যায়। এটা একটা পালটা গোছের, আমাদের যেমন পালটা হয় না?—সা-রে-সা-গা-সা-মা-সা-পা—এরকম হয় আমাদের পালটা, সেইরকমই। ওদেরটা আর-একটু জটিল, নেই-নেই-নেই-নেই করে একটা আওয়াজ। মুখের সামনের দিক দিয়ে আমরা গানটা করি তো, আগেকার দিনে কেউ কেউ গান করতেন গলার ভিতরের কণ্ঠস্বরটা দিয়ে। সেইভাবে গান এখন কেউ গায় না। কৃষ্ণচন্দ্র দে, বা জ্ঞান গোসাঁই গাইতেন। যাকে বলে ভিতরের গলা। আমেরিকানরা বলে হেড ভয়েস। এই হেড ভয়েসটা কী আমি ভালো বুঝিনি। এই এক্সারসাইজ করতে গিয়ে বুঝতে পারছি হেড ভয়েসটা হল একটা ধ্বনি, এই নেই-নেই-নেই আওয়াজ করে তিনটে সপ্তক আমাকে যেতে-আসতে হবে ওই পাল্টার প্যাটার্নে। ধরো সা-ধা-পা, রে, মা, ধা, বুঝতে পারছ? সা-রে-ধা-পা-নি—এইরকমভাবে। প্রথমে নেই-নেই, নেই-নেই করে যাওয়া-আসা। তারপরে ম-ধ্বনিটা—ম-ম-ম-ম-মম্—এইটা ভিতরের এলাকার কাজ। তার পরে বাচ্ছারা যেভাবে গাড়ি চালানোর সময় আওয়াজ করে মুখে ফ্র-র ঠোঁট দুটো কাঁপিয়ে আওয়াজ। এইভাবে সুরে গাইতে হবে—ভীষণ শক্ত। এটা একটা ডিফারেন্ট

ভয়েসেস্ বলতে পারো, মাস্‌ল্ এক্সারসাইজ নয়। আমি এটা করে অদ্ভুত ফল পেয়েছি। এই বয়েসে গলার ভয়েস বা নমনীয়তা তো চলে যায়, কিন্তু আমার ওই নমনীয়তাটা অনেকটাই বজায় আছে।

সু : আপনি বলছিলেন, ধ্বনি নিয়ে কাজ করেন, এটা কার জন্য করছেন? সম্পূর্ণ নিজের জন্যই?

সুমন : একেবারে নিজের জন্য। এখন তো আমায় কেউ কাজ দেয় না। কিছু করতেও তো বলে না—। ধরো ধ্বনি দিয়ে তৈরি একটা মহাকাশ, কিংবা ধরো ফিল্মের ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য যে ধ্বনি দরকার হয়, এটা নিছক শব্দ নয় মিউজিক্যাল সাউন্ডস্। এটা ভীষণ ডেভলপড্ একটা ক্ষেত্র, প্রযুক্তি! নানান ধরনের ট্র্যাডিশনাল যন্ত্রের আওয়াজ, তেমনি নানান ধরনের ভারচুয়াল যন্ত্র, যেগুলো ফিজিক্যালি তৈরি করাই সম্ভব নয়, সেগুলো তৈরি করা। ধরো বাঁশিতে একরকম আওয়াজ বের হয়। আর এই পদ্ধতিতে অন্য-একটা আওয়াজ বের করা যায়। বাঁশির মতো অন্য কিছু আসলে বাঁশির আওয়াজ নয়। এটার রোমান্টিক একটা আবেদন আছে আমার কাছে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, মিউজিক পিস করব। নিজের জন্য করিও, কিন্তু তারপর আর রাখি না। গানে আমি প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। কালকেই আমি একটা গান করছিলাম, 'রামপ্রসাদ' নামে আমার নতুন একটা গান আপলোড করছিলাম। তাতে আমি যে ধ্বনিগুলো ব্যবহার করছি, ট্র্যাডিশনাল ধ্বনি বা আওয়াজ। দু'ধরনের বাঁশি, ওপেন ফর্ম, বেস এবং তাল যন্ত্র, তাল যন্ত্রের মধ্যে ঢোলকের এফেক্ট আমি বার করেছি। এ সমস্তই কি-বোর্ডে বাজিয়ে বাজিয়ে। তা এইগুলো আমার ফ্যাসিনেটিং, আমার কল্পনাকে, ভাবনাকে দখল করে রেখে। যদি কোনো ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রি আমাকে ব্যবহার করতেন তাহলে এটা নিয়ে আরও খানিকটা খেলার জায়গা পেতাম। সে সুযোগ আমি পাই না। কাজেই এটা আমার নিজের সঙ্গে নিজের খেলা, সময় কাটানো আর কি!

সু : এটা হচ্ছে আপনার একটা গড়পড়তা দিনের হিসেব, এর বাইরে আপনি কি কাউকে গান শেখান?

সুমন : হ্যাঁ আমি গান শেখাচ্ছি, সেটা তো গড়পড়তা দিন নয়। রোববার সকালে শেখাচ্ছিলাম, এখন শনিবার সন্ধেতেও ক্লাস নিচ্ছি। জনা বারো-চোদ্দো ছাত্র আছে আমার, তারা কেউ ছোটো না, যুবক-যুবতী থেকে শুরু হয়ে মধ্যবয়সি

অবধি। এমনকি একজন রিটায়ার্ড মানুষও আছেন। এরা কেউ শিল্পী না, মনের আনন্দে গানটা শিখতে চান।

সু : আপনি যে ধ্বনি নিয়ে কথা বলছিলেন, আমার প্রশ্ন এই যে ধ্বনি নিয়ে, সহগায়কদের মধ্যে একটা সক্ষমতা তৈরি করে, সেটাকে নিয়ে খেলা করা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, এটা তো আপনার 'নাগরিক'-এর যুগেও ছিল।

সুমন : হ্যাঁ, নাগরিকের যুগেও ছিল এটা ঠিক, কিন্তু 'নাগরিক'-এ আমি তো শিক্ষক ছিলাম না। হ্যাঁ, কিছুটা তালিম দিতে হত। তবে এখানে আমি পুরোপুরি শিক্ষক। আমি শুধু গান তোলাই না, সংগীত সম্পর্কে একটা সার্বিক ধারণা দিতে চেষ্টা করি। বিশেষ করে ভারতীয় রাগসংগীত সম্পর্কে। কীভাবে রাগগুলোকে চর্চা করতে হয়, শিখতে হয়। প্রায় ৩০-৪০ মিনিট সেই চর্চাটা চলে। বন্দিশ নয়, রাগ। আমাদের প্রত্যেকটা দিন শুরুই হয় কোনো-না-কোনো রাগ দিয়ে। তারপরে গানটা কীভাবে গাইতে হবে শুধু গান তোলা নয়—কীভাবে গাইতে হবে সেটা শেখাই। হ্যাঁ খুব ভালো ফল পাচ্ছি আমি।

সু : আপনি নিজে যখন গান শিখেছেন, তখনকার গায়কীর ধরন, গলা-প্রক্ষেপের ধরন সেই ঘরানা ও পরম্পরাটার মধ্যে দিয়ে আপনি সুমন হয়ে উঠেছিলেন। মাঝে আপনার গান-চর্চার দীর্ঘ একটা সময় পেরিয়ে গেছে। এখন আপনি নিজে যখন শেখাচ্ছেন, আপনার শেখা ওই পুরোনো ধরনটার সঙ্গে আজকের স্বর-প্রক্ষেপণের ধরনটা নিশ্চয়ই বদলে গেছে। এই বদলটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন? সেটাই তো যুগের পরিবর্তন।

সুমন : দ্যাখো, আজ যাঁরা গান গেয়ে নাম করেছেন, করছেন বা করতে চাইছেন—তাঁরা, আর আমার কাছে যাঁরা গান শিখতে আসে—এই দুই দলের মধ্যে একটা মৌলিক তফাত আছে। যাঁরা গান গাইছেন বাজারে, তাঁদের হাব-ভাব দেখে মনে হয় সব পণ্ডিত লোক। যেমন একবার কোরাসের প্রয়োজন হয়েছিল। সুমন মুখোপাধ্যায়ের 'কাঙাল মালসাট' ফিল্‌ম-এর ভয়েস, আমারি লেখা এবং সুর দেওয়া ঝিনচ্যাক্ ছাড়া কিছু থাকবে না। আমারই lead vioce, সঙ্গে কোরাস চাই। তা চার-পাঁচ জনকে বলা হয়েছিল, তাঁরা এলেন। প্রথম যিনি এলেন, মাথায় একটা মিষ্টি টুপি পরা, বেশ মিষ্টি ছেলেটি। আমি বললাম যে, 'বাবা তুমি গান শিখছ?' বললে 'আমার শেখা হয়ে গেছে।' 'তুমি কার কাছে শিখেছ?' তা ছেলেটি দুটো কানে হাত দিয়ে গুরুর নাম করছে। আমি আমার ছেলেবেলাতে দেখিনি। গুরুর নাম, স্বামীর নাম নিতে নেই, তাই কান ধরে

বলা। এটা আমার খুব হাস্যকর লাগল। মনে হল, এখনকার গুরুরা বোধ হয় গানটা শেখান না, কান ধরাটা শেখান। তো ছেলেটি এই সময় বিশেষ এক চক্রবর্তী পণ্ডিতের কাছে দু'বছর গান শিখেছে। আমি বললাম 'কী শিখেছ?' বললে 'কেন—ক্ল্যাসিক্যাল'। আমার প্রশ্নটা সে আসলে বুঝতে পারেনি। বললাম 'কোন্ আঙ্গিকে শিখেছ?' বললে—'খেয়াল।' আর বললাম 'ঠুংরি?' দেখছি ঘাড় নাড়ছে। যেটা বলছি, সেটাই ঘাড় নাড়ছে। তারপর বলছে, 'আপনি অমুক সিনেমাটা দেখছেন? ওতে সাউন্ডট্রাকে, অডিয়োট্রাকে আমার ভয়েস আছে।' অর্থাৎ যেটা বলতে চাইছি, সবাই পণ্ডিত হয়ে গেছে। এরা সবাই গান গাইছে। এরা গানটা শেখার প্রয়োজন বোধ করছে না। সবই শেখা হয়ে গেছে। কেউ কেউ ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে। আমার কাছে যারা আসে তারা এই বলেই আসে যে, আমি কিছু জানি না, এরা শিখতে আগ্রহী। এদের শেখার যে আগ্রহ, তাদের সঙ্গে আজকের সময়ে যারা গান গেয়ে নাম করছে বা করতে চাইছে তাদের বিপুল তফাত আছে। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা দুনিয়া।

সু : আপনি নিজে যে-সময় গান শিখেছেন, আর আজ যখন নিজে শেখাচ্ছেন, সেখানে গানের ধারাটা, জগৎটা পুরোপুরি পালটে গেছে। এই পরিবর্তনটা আপনি কীরকম লক্ষ করছেন।

সুমন : ভালো প্রশ্ন করেছ। দ্যাখো আমি নিজে যখন গান শিখেছি, খুব ভালো কিন্তু শিখতে পারিনি। তখন যে ত্রুটিগুলো আমার ছিল, সেই ত্রুটিগুলো কী কী, কী-ধরনের ত্রুটি, সেগুলো বুঝতে বুঝতে আমার বয়স অনেক বেড়েছে। ফলে আজ যখন আমি একটা গানকে শুনি, গানটাকে নিয়ে ভাবি, ভালো করে বুঝতে চাই কী ধরনের স্বর-প্রক্ষেপ গানটায় চলবে বা কোন্‌টা চলবে না এবং একটা ছাত্র বা ছাত্রীকে তাঁর অবস্থাটায় দাঁড়িয়ে, সেই অবস্থাটা মেনে নিয়ে আমি কতদূর ইমপ্রুভমেন্টের দিকে যেতে পারি। এই বোধটা আমার আগে ছিল না। গান গাইতে-গাইতে, ক্রমাগত শিখতে-শিখতে, আজও শিখি—আমি লোকটার যে হয়ে ওঠা, পরিণত বয়সের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি ওই বোধটা অর্জন করেছি। আজ মনে হয়, আমার বয়সটাকে কেউ যদি অলৌকিকভাবে কমিয়ে দেয়। তাহলে আমি আরও অনেক ভালো গান গাইতে পারতাম।

সু : প্রযুক্তি পালটে গেছে, পালটাচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রযুক্তির সঙ্গে গান গাওয়ার ধরনটাও প্রত্যেক দশকে পালটেছে। স্বরক্ষেপের প্রযুক্তিও পালটেছে। আপনি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে নিশ্চয় অনুভব করছেন যে সেকালে রেডিয়োতে গান

গাওয়া, রেকর্ড করা, সেখান থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে গান গাওয়ার পার্থক্যটা কী বিরাট! পেশাদার জীবনে আপনি যখন লাইভ গেয়েছেন, আর আজ যাঁরা লাইভ গান—এই দুটোর ম´ একটা পার্থক্য ঘটে গেছে। আমি জানতে চাইছি, এতে করে আজকের গায়কদের স্বর প্রক্ষেপের ধরনটা, পদ্ধতিটা কতখানি বদলে গেছে?

সুমন : একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, চারের দশকে যে মাইক্রোফোন ছিল—ধরা যাক আমি যখন বেতারে কিংবা বড়োদের আসরে গান গাইছি, আমার আঠারো বছর বয়স থেকে—তখন থেকে দীর্ঘকাল বেতারে গান গেয়েছি, সেখানে এফেক্ট প্রসেসর বলে কিছু ছিল না। বা যখন থেকে রেকর্ডিং করেছি, বাহাত্তর-তিয়াত্তর সেখানেও এফেক্ট প্রসেসর ছিল না, শুধু একটা তার মাইক্রোফোন থেকে বেরিয়ে মিক্সারে ঢুকে গেছে। মিক্সার থেকে রেকর্ড হচ্ছে টেপ রেকর্ডারে। মাঝখানেরও কিন্তু হস্তক্ষেপ হচ্ছে না, যেমন ধরো ডিলে বা রিভার্ব, এখন তো আরও কত কি বেরিয়েছে—কমপ্রেসর, ওর‍্যাল একসাইটার, নয়েজ গেট, অমুক তমুক...নানান জিনিস। আমরা সেসব ভাবতেও পারতাম না। তা এইসব বেরিয়ে যাওয়ার ফলে, স্বাভাবিকতাটা নষ্ট হয়ে গেছে। পুরোনো দিনের কোনো রেকর্ড শুনলে মনে হয় যেন, আরে—গানটাই শুনছি। আজকের দিনে রেকর্ডিং-এ সেই ক্ল্যারিটি, সেই স্বচ্ছতা নেই, আর সেই দক্ষতাটাও নেই। মাইক্রোফোনের সামনে গাইছি, মেপে গাইতে হবে এই চিন্তাটা এসেছিল অনেক পরে—শ্যামল মিত্র বা হেমন্তবাবুকে আমি মাইক্রোফোনের সামনে গাইতে শুনেছি ফিসফিস করে। এই স্টাইলটা তাঁরা তখন তৈরি করছেন। তবে ধনঞ্জয়বাবু বড়ো গলায় গাইতেন। কিশোরকুমার, আমি এটা সাবিনার কাছে শুনেছি, সাবিনা কিশোরবাবুর সঙ্গে ডুয়েটে একাধিকবার গেয়েছেন, কিশোরবাবু মাইক্রোফোন থেকে এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে খোলা গলায় গাইতেন। মৃত্যুর আগেও গেয়েছেন। কিশোরকুমার মারা গেছেন বোধ হয় কুড়ি...?

সু : সাতাশ বছর।

সুমন : তা ওই সাতাশ বছরেই মেন্‌লি পরিবর্তনটা হয়েছে হার্ডওয়্যারে নয়, সফট্‌ওয়্যারে। আগে নয়ম্যান যে মাইক্রোফোনটা বেচত, বেসিক্যালি সেই প্রযুক্তিটা সে আজও বিক্রি করছে। হাইজার—এসব বিখ্যাত মাইক্রোফোন মেকার। তাদের ভিতরকার যে যন্ত্রাংশ, সেই ক্ষেত্রে নতুন কোনো আবিষ্কার

হয়নি। যেটা হয়েছে সেটা কমপিউটার সফট্ওয়্যারে কিছু ঠান্ডা ব্যাপার ঘটছে, কমপিউটার হার্ড ডিস্কে রেকর্ডিংটা হয়তো, সেটাতে যে কোল্ড ব্যাপারটা ঘটছে সেটাকে গরম করার জন্য ওদের কিছু যন্ত্রের ব্যবহার নিতে হচ্ছে। তাতে করে যে স্বর প্রক্ষেপ তার স্বাভাবিকতা ও প্রত্যক্ষতাটা চলে যাচ্ছে। আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে, সব গলাকেই একইরকম মনে হচ্ছে। স্বর প্রক্ষেপ-ওয়াইজ শিল্পী সচেতনভাবে গায়, তা তো নয়। ধরো রূপঙ্কর যেভাবে গান গান, মনে হয় না যে তিনি আগে মানে পাঁচের দশকে বা ছয়ের দশকে অন্যরকম কিছু গাইতেন। হ্যাঁ, তিনের দশকে ডেফিনিটলি করতে হত। এখন স্বর প্রক্ষেপের ধরনটা পালটেছে এই—আমি খুব দুঃখিত, বলতে বাধ্য হচ্ছি—কোনো ক্যারেকটার পাচ্ছি না। নচিকেতা চক্রবর্তীর মধ্যে, তাঁর গায়নভঙ্গির মধ্যে একটা আলাদা ক্যারেকটার পেয়েছিলাম। ইন্দ্রনীল সেন অত্যন্ত সুকণ্ঠী ছিলেন, কিন্তু তাঁর গায়কীর মধ্যে কোনো ক্যারেকটার নেই। পাঁচের দশকের শিল্পীদের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব ছিল, সেটা আজকের শিল্পীদের নেই। এই পরিবর্তনটার পিছনে অবশ্যই জড়িত রয়েছে স্বর প্রক্ষেপের ব্যাপারটা। আসলে এখনকার শিল্পীদের আর সেরকম গান শিখতে হচ্ছে না, অডিশনে না গিয়েই সে প্লে-ব্যাক করার সুযোগ পাচ্ছে, ফাংশন করছে, দেড় লক্ষ করে পার-শো টাকা নিচ্ছে। এক লক্ষের নীচে তো কেউ নিচ্ছেনই না। আমি চাইলে অবশ্য লোকে মুখ ব্যাজার করছে। যাই হোক, ওই ব্যাপারটার মধ্যেই শিল্পীরা এমন জড়িয়ে যাচ্ছেন, গানটা ভালো করে গান—এই দাবিটাই তো আজ আর নেই। ভাবো একসময় রেডিয়োতে গান গাইতে গিয়ে যদি ধ্যাড়াতাম, একটু পান থেকে চুন খসলে চিঠি পেতাম। যাঁরা সিনিয়ার অভিভাবক-জাতীয় তাঁরা বলতেন—এটা কি, হলটা কী? সিনিয়াররা রেডিয়ো খুলে বসতেন, ভুল হলে বলতেন—এটা তো ঠিক হল না বাবা। ভালো হল না। এমনকি তেমন হলে রি-অডিশন পর্যন্ত হত। ফলে এখন আর কোনো দায় নেই, দায়িত্ববোধ নেই।

সু : যন্ত্রের উপর দায়িত্বটা ছেড়ে দেওয়ার ফলে শিল্পীর দায়টা কমে যাচ্ছে?

সুমন : আমি কিছুদিন আগে জাতিস্মর ছবির জন্য রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে ঢুকলাম। শুনলাম, দেখলাম নতুন অনেক কিছু হয়েছে। কী হয়েছে? সব কিছুকেই মনে হচ্ছে অদ্ভুত একটা ঘেরাটোপ, যেন কোনো প্রাণ নেই। উষ্ণতা নেই। যিনি দায়িত্বে রয়েছেন, অত্যন্ত প্রশিক্ষিত, ভদ্রতাবোধ অসামান্য। তাদের কাছে গল্প

শুনলাম, আজকালকার প্রায় সব কণ্ঠশিল্পীই বেসুরো গান। এবং পিচ কারেকটিং সফ্‌টওয়্যার আছে। শিল্পীরা বলেন যে ঠিক করে নেবেন। ইঞ্জিনিয়াররা রাত জেগে জেগে পিচ কারেক্ট করে আর শিল্পীরা ভুল-ভাল গেয়ে চলে যায়। কোনো শিক্ষিত সভ্য দেশে এমনটা কল্পনা করা যায় না। আমি তো নয়ের দশক থেকে শুনছি যে গায়ক বলছেন 'দাদা একটু মশলা দিয়ে দেবেন'—মানে রিভার্ব দিয়ে দেবেন। যে মুহূর্তে রিভার্বটা দেওয়া হবে, তেমনি গানটা ডিলে হবে, ভেসে ভেসে যাবে, তাতে গানটার ত্রুটিগুলো ঢাকা পড়ে যাবে। তা এইসব পরিবর্তনই হয়েছে।

সু. : আপনাকে যদি বলা হয় কবীর সুমনের গানের জীবনটার একটা অ্যাসেসমেন্ট করতে, কী বলবেন আপনি?

সুমন : আমি শুরু করেছিলাম গানের প্রতি ভালোবাসা থেকে। বাবা গান শেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, তাই থেকে উঠে আসতে পেরেছি। কিন্তু যে-অর্থে শ্যামলবাবু বা ধনঞ্জয়বাবু অসাধারণ এক-একজন কণ্ঠশিল্পী, তাঁদের ধারে-কাছে আমি পৌঁছোতে পারিনি। আবার একটা সময়ের পর আমার মনে হয়েছিল যে, গান আমাকে যদি গাইতেই হয় তাহলে আমাকে লিখে আমাকেই সুর দিয়ে গাইতে হবে। তাহলে আমাকে সেই ক্ষমতাটা অর্জন করতে হয়। সুর দেওয়ার অভিজ্ঞতাটা আমার অল্প বয়স থেকেই ছিল, কিন্তু গান লেখার ক্ষমতা ও অভ্যেস আমাকে অর্জন করতে হয়েছে। এবং একটা সময় একটা মন্ত্রবলেই হয়তো আমি একটু-একটু লিখতে পেরেছি আর সেগুলোকে সুর দিতে পেরেছি। এই ক্ষেত্রে আমি কিছু কাজের কাজ করতে পেরেছি। কিন্তু ভালো কণ্ঠশিল্পী—শ্যামল মিত্র, মান্না দে, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, পান্নালাল ভট্টাচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সেই সময়ের নিরিখে খুব কঠোরভাবে বলছি, এঁরা যে অর্থে বিরাট মাপের কণ্ঠশিল্পী, আমি কিন্তু তাঁদের ধারে-কাছে পৌঁছুতে পারিনি। মনে হয় না, পরবর্তীকালে আর কেউ সেটা পেরেছেন। কাজেই, এই হল নিজের সম্পর্কে আমার অ্যাসেসমেন্ট। আমি বিশেষভাবে বলতে পারি গানে কোথায় কি যন্ত্র প্রয়োগ করা হবে, কীভাবে হবে, ইলেকট্রনিক মিউজিক— আমেরিকায় থাকার সময় থেকেই যখন ব্যাপারটা জনপ্রিয় হয় ও ছড়াতে থাকে, আমি সেটা শিখে নিতে পেরেছি। এই বিষয়টার উপর অনুসন্ধিৎসা বরাবরের। এই যে এটায় আমার মনে হয় কিছু অবদান রাখতে পেরেছি। আর নিজের গান

নিজের মতো করে গাইতে পারার স্টাইল তৈরি করে নেওয়ার ব্যাপারটাও আমি পেরেছি।

সু : আপনার সময়ে বাংলা গান বিচিত্র বিষয়ের দিকে ঝুঁকেছিল। 'তোমাকে চাই' আমাদের কাছে বিষয়গতভাবে একেবারেই নতুন ছিল, আপনি পুরোনোকে ছেড়ে ওই নতুনটাকে আনতে পেরেছিলেন। সেটা দিনকাল পালটানোর সঙ্গেও যুক্ত। কিন্তু নব্বই-এর পর আরও বাইশ-তেইশ বছরে বাংলা গান আবারও অনেক পালটেছে। ভবিষ্যতে নতুন সময়, নতুন চ্যালেঞ্জ। বাংলা গানে কণ্ঠ শিল্পটা খারাপের দিকে নেমেছে ক্রমশ, মিউজিকের বাড়বাড়ন্ত গায়কীকে চাপা দিয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলা গান তৈরির অনুপ্রেরণা কোথা থেকে আসতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

সুমন : অনুপ্রেরণা জীবন থেকেই আসবে। একটা কথা খুব স্পষ্ট করা দরকার। আজকে যেমন—কাউকে আমি হতোদ্যম করতে চাইছি না—ধরো, গান মায়ের পেট থেকে নিয়ে কেউ জন্মায় না। আমি বি. এ, এম. এ পাস করেছি, দু'কলম লিখতে পারি, লিটল ম্যাগে আমার লেখা ছাপায়, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি গান লিখতে পারব বা আমি গীতিকার হয়ে গেলাম। গান জিনিসটা সেরকম নয়। সুরের ব্যাপারটা তো মোটেও তা নয়। সুর করাটা একেবারেই অন্য গল্প। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল সকলেই গীতিকার এবং সুরকার হয়ে গেছে। এর ফলে হচ্ছে কি, কিছুই দাঁড়াচ্ছে না। তাদের সাধ আছে ষোলোআনা, সেটাকে আমি মোটেও ছোটো করছি না। কিন্তু সাধ্যটা আলাদা জিনিস। সাধ্যটার জন্য তাদের কোনো চর্চা নেই। কোন্ উপাদান দিয়ে আমি গানটা করব, সেটার জন্য যে দেশে আমি আছি, সেই দেশের সাউন্ডস্কেপের মধ্যে যদি আনতে না পারি, তাহলে তা তো মানুষের কাছে পৌঁছবে না। রিলেট করতে পারবে কী করে? অন্যদিকে আবার লোকের কাছে হয়তো পৌঁছবে, কিন্তু কতদিন সেটা বেঁচে থাকল সেই প্রশ্নটাও তো উঠে আসে। দ্যাখো, একটা প্রজাপতি মানুষের হিসেবমতো ২৭ দিন বাঁচে, সেটা তার সারাজীবন। কিন্তু কোনো কোনো গান একসময় পপুলার হয়েছে, রেডিয়োতে বারবার বাজানো হয়েছে। কিন্তু কই, সেসব গান আজ তো শোনা যাচ্ছে না। আগেকার গায়কদের গান দীর্ঘকাল রেডিয়োতে বাজানোর ফলে তার মর্যাদার জায়গা তৈরি হয়েছে। আর তাঁরা নিশ্চয়ই সেই মর্যাদার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু সবটাই কি! বুড়ো বয়স পর্যন্ত অষ্টাদশীর জন্য 'কাজল নয়না হরিণী' করে যাওয়াটা খুব কি কাজের কথা?

বুড়ো বয়সের প্রেমের গান আমার আগে কেউ করেনি, আমার পরেও খুব একটা নেই। বয়স্ক লোক আর কোথায় যে গান লিখছে? মনে হয় আমিই বুড়ো-তম। একটা গান নিজেকে তৈরি করে। কীভাবে? উপাদানগুলো। রবীন্দ্রনাথের কত গানে বাউলের সুর, কীর্তনের সুর ঢুকে আছে—এগুলো সঞ্চয়, সংগ্রহ। এখান থেকেই কিন্তু উৎসারিত হচ্ছে তাঁর সংগীত, স্বদেশিগান, তার আঙ্গিক-রূপ-রস-ছাঁদ। এগুলো সবই একজন মানুষের সংগ্রহ, শোনার অভ্যেস থেকে ওই সংগ্রহটা আসে। কিন্তু আজকের দিনে যাঁরা গান তৈরি করছেন বা করবেন, আমার প্রশ্ন তাঁদের সংগ্রহে কী থাকছে, গান তৈরির উপাদান বা মালমশলা কী থাকছে? আমি একটা উদাহরণ দিই। কবির চট্টোপাধ্যায় —এই সময়ে যাঁরা গাইছেন তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সুকণ্ঠী। কিন্তু কবিরের গানগুলো একই রকমের হয়ে যাচ্ছে। তার একটা কারণ হতে পারে অঞ্জন দত্তের প্রভাব। অঞ্জন দত্ত মহোদয়ের গানের ধাঁচ এবং গাইবার ধরনটাই তাঁর গানে চলে আসছে। আর তাই যদি হয়, তাহলে আমি অঞ্জনের গানই শুনব, এঁদের গান শুনব কেন? অঞ্জনের প্রভাবে এঁরা যেটা তৈরি করছেন, সেটা একটা সময়ে অঞ্জনই সব থেকে ভালো করেছেন। এঁদের ঠিক হচ্ছে না। সব ভালো-ভালো কথা দিয়েই যেমন ভালো গান হয় না, তেমনি সব রাগের কথা দিয়ে বিদ্রোহের গান হয় না। অভিজ্ঞতার একটা ব্যাপার আছে তো, ওই সংগ্রহ এবং যাচাই করার অভিজ্ঞতা। গান হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সুর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, অঞ্জন আমার বিশিষ্ট বন্ধু, খুবই সৃজনশীল মানুষ, বড়ো মনের মানুষ, কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি ওর গান কিন্তু একটু একঘেয়ে... একটার-পর-একটা। সংক্ষেপে এটুকুই বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায়—'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম/তব অকৃপণ করে, গানে বলছেন 'আমরা দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় যত/যত্নে ধরে রাখি/সে যে রজনীর স্বপ্নের আয়োজন।' এখন আমরা দিবসের সৈন্যের সঞ্চয় বা বিত্তের সঞ্চয়—যেমন হোক সঞ্চয় করি। সেটা সচেতন অথবা অবচেতনেও হতে পারে। যেমন একটা শব্দ—'ঘষা পয়সার মতো', রবীন্দ্রনাথ যেমন 'প্যাশন'-এর বাংলা করেছিলেন 'সংরাগ', সুধীন দত্ত এরকম অনেক শব্দ তৈরি করেছিলেন, এগুলো বাংলা ভাষার সঞ্চয় হয়ে উঠেছে। তেমনি সুরের ইডিয়ম মাথার মধ্যে ঢুকে যায়। আমার কাছে গান তৈরি করাটা, শব্দ এবং সুর তৈরি করাটা রজনীর স্বপ্ন। আর তার আয়োজনটা অনেক আগে থেকে করতে হয়। এটা না হলে গান

তৈরি করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, গান হয়তো অনেক তৈরি হচ্ছে, কিছু আকর্ষণীয় কথা থাকছে, বাজনা—গিটার বাজছে, ঝমঝমাঝম মিউজিক হচ্ছে—কিন্তু আলটিমেটলি কিছু দাঁড়াচ্ছে না। অশিক্ষিত পটুত্ব বলে কিছু হতে পারে না, সংগীতে তো একেবারেই না। প্রতিটি মানুষকে নিজের ক্ষেত্রে বড়ো হওয়ার জন্যে শিখতে হয়,ঘরামিকে যেমন কাজ শিখতে হয়, ডাক্তারকেও প্রচুর পড়াশোনা ও হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। গান যে গাইবে, তাকে তো শিখতে হবে, শুনতে হবে। যে দেশে, যে সমাজে সে থাকে সেখানকার সব কিছুকে ফেলে দিয়ে আমরা সবাই যদি শুধু বিদেশি সংগীতের দিকে ধাবিত হই, তাহলে হবে না, কিছু বেরোবে না।

সু : কিন্তু আমাদের যে প্রত্যেকদিনের শোনার সাউন্ডস্কেপ সেটাও তো পালটে যাচ্ছে, আপনার যুগে আপনি যে-সমস্ত লোকগান বা লোকজ সংস্কৃতি —কীর্তন বা বাউলের যতটা কাছাকাছি ছিলেন, বর্তমানে সেটা তো একেবারেই উধাও। আজকের গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে যে-অভিজ্ঞতার জগৎ রয়েছে, সেখানে ওই সংস্কৃতিটা তো নেই। এটা তো তাদের অপরাধ নয়—তারা শিকড় থেকে সরে যাচ্ছে।

সুমন : ঠিক বলেছ, সরবে, সরবে তো বটেই। তার মধ্যে অপরাধ কিছু নেই, সেটা অপরাধের বিষয় নয় বরং একটু দুঃখের বিষয় হতে পারে আমার মতো লোকের কাছে। কিন্তু সমস্যাটা হল ইডিয়মের। ধরো অঞ্জনের এই গানটা (সুর করে)—'খাদের ধারের রেলিংটা।' কিশোরকুমারের গানের সুর—'রাহি তু মত্ রুখ যানা', *দূর গগন কি ছাও মে* ছবিতে ছিল। অন্যান্য যে গানের সুরগুলো, সেগুলো পুরোনো কোনো-না-কোনো পরিচিত ইংরেজি গানের সুর। যেমন হল 'শুনতে কি পাও'-এর সুর হল কোহেলের **sisters of mercy**। দীর্ঘকাল ধরে শোনা তো, আমাদের স্মৃতির মধ্যে ঢুকে যায়। নচিকেতা চক্রবর্তী—দাপুটে সংগীতশিল্পী—ওঁর কিছু গানে, গীত বা কাওয়ালির ধাঁচ বেশি করে পাচ্ছিলাম। কিন্তু যেটা বলার নচিকেতার গানে আমি কিন্তু পল্লিগীতি, বাংলার পল্লিসংগীতের ছোঁয়া কোনোদিন পাইনি—একটি গানেও নেই। ধারাবাহিকভাবে ওঁর গান আমি শুনেছি, কখনো-কখনো গেয়েওছি। কোথাও কোথাও আধুনিক পুরোনো গানের ধাঁচের গন্ধ ছিল। কিন্তু সেটা আউট নাম্বারড হয়ে গেছে, সংখ্যার দিক থেকে হেরে গেছে। ওই বিশেষ ধরনের হিন্দি গানের ধাঁচের প্রভাবে এটা হয়েছে। তবু সেটা ছিল। কিন্তু কালক্রমে যেটা হচ্ছে, সাহেবরা যেভাবে গিটার

বাজান, সেরকম হয়ে যাচ্ছে। আমি একটা উদাহরণ দিই। একটা 'মেশিন' নামে যন্ত্র উঠেছে, মস্ত বড়ো জার্মানি যন্ত্র উদ্ভাবক এবং বিক্রেতা কোম্পানি এটা বের করেছে। এর নাম হয়েছে 'গ্রুভ' মেশিন। গ্রুভ কি, একটা বিশেষ তালের ধাঁচা। যেমন ধরো ধা-ধিন-ধিনতা, ধা-ধিন-ধিনতা, না-ধিন-ধিনতা, তেটে-ধিন-ধিন-ধা—এই যে তিনতালের এই বোলটা, এই বোলটা যদি আমি সম্পূর্ণ করি তাহলে সেটা একটা গ্রুভ। এই গ্রুভ মেশিন ব্যবহার করে একজন লাট-বেলাট হয়েছেন এমন একজন মানুষ, এক শিল্পী। ইউটিউবে তার একটা ভাষণ রয়েছে সেই মেশিনটা নিয়ে। তিনি বলছেন এই মেশিনটার যে সফট্ওয়্যারটা সেটা আমি আমার আইপ্যাডে ভরে নিয়েছি। অর্থাৎ আমাকে আর স্টুডিয়োতে যেতে হয় না, তালটা ঠিক করে ফেললাম, এরপর স্টুডিয়োতে গিয়ে তালটাকে ঢুকিয়ে দিলাম কমপিউটারে। কমপিউটার বাজতে শুরু করল। তারপর একটা পিয়ানো শিল্পী এসে এর উপর একটু পিয়ানো বাজাতে শুরু করল। তারপর আমরা ওই অনুযায়ী গানটা তৈরি করতে শুরু করলাম। এই জায়গায় চলে এসেছে সংগীত সারা পৃথিবীতে। অর্থাৎ, আমি বলছি না যে সাত মাস উপোস করে, সারাদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে সংগীত করতে হবে, সেটা আমি বলছি না। কিন্তু আমেরিকার এই ধরনের গানগুলিই এখনকার ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কাছে বড়ো অনুপ্রেরণা। বলিউডের হিন্দি গানও চাই। প্রোডিউসাররা বোধ হয় এরকমই চাইছেন। ফলে গানটা তৈরি হবে কোন্ উপাদানে? এটা একটা বড়ো প্রশ্ন। সত্যি-সত্যিই অনেক নতুন ছেলে-মেয়ে, যাঁরা গান তৈরি করতে চান, সোৎসাহে এগিয়ে এসেছেন। কেউ কেউ এটাকে এমনকি পেশাও বানিয়ে ফেলেছেন। ছেলেই বেশি, দু-একটি মেয়ে। তারা আমার কাছে আসে, কথা বলেন। তারাও অসহায় বোধ করছেন। স-সহায় তাঁরা কী হিসেবে হবেন? কী করে ভাবলেন তাঁরা স-সহায় হওয়ার কথা? কবীর সুমন এভাবে গান কোনোদিন করেননি। আমাকে শিখতে হয়েছে, অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, দীর্ঘকাল চর্চার মধ্যে দিয়ে আমাকে এটা অর্জন করতে হয়েছে। আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে, যদি পড়ে কারও বোধোদয় হয় 'জাতিস্মর'-এর কবিয়ালদের গানগুলো সবাই শুনুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। সুর কীভাবে করতে হয়, একটু বুঝতে পারবেন। হারানো কবিয়ালরা কীভাবে সুর করতেন, তার তো কোনো রেকর্ড নেই, নোটেশান নেই। ওই কথাগুলোর উপর আমি সুর করেছি। সেই সুরটা কী হবে? ওই টকা-টক-কা— গ্রুভ? না

অঞ্জন দত্ত যেভাবে করেন 'খাদের ধারে রেলিংটা'—এই সুর হবে? হবে না। এটা হতে হবে রাগসংগীত। বাংলায় রাগসংগীতকে কীভাবে ব্যবহার করেছে—ভক্তিগীতিতে, কথকতায়— সেগুলোতে এক্সপোজড্ হতে হবে। আমি সেটা পেরেছি কারণ আমি প্রথমত আমার মেধাটা ওইরকম। দ্বিতীয়ত আমার জন্ম ১৯৪৯ সালে। ফলে আমার কাছে পৃথিবীটা অনেক বড়ো ছিল। আমি জন্মেই রাহুলদেব বর্মনকে পাইনি। আমার আধুনিকতা রাহুলদেব বর্মনে শুরু হয়নি, যদি সেইটা হয়ে দাঁড়াত, এবং সেই সঙ্গে আমেরিকার সাহেবদের গান শুনে যদি বড়ো হতাম তাহলে তো ভয়ানক ব্যাপার।

সু : এই সংকটটা কি সারা পৃথিবীতেই ঘটছে?

সুমন : আমার মনে হয় সারা পৃথিবীতেই, সারা পৃথিবীতেই এই অবস্থা।

সু : আপনি বারবার বলেছেন মাপকাঠির অভাবটা বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে সব জায়গাতেই। সারা পৃথিবীতেই তো এখন যে-কেউ গান গাইতে পারেন, মাপকাঠি লাগে না।

সুমন : সারা পৃথিবী আমি বলব না। এই ধরো হাঙ্গেরি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, চিন—এদের খবর কিন্তু আমরা রাখি না। আমরা ইংরেজিভাষী দুনিয়ার বিশেষ করে আমেরিকার খবরটাই রাখি মাত্র। সেখানে তো আজ করুণ অবস্থা। একজন বিশেষজ্ঞ, সংগীত বিশেষজ্ঞ বলছিলেন ওখানে হিন্দি সিনেমার—ওই মাঝামাঝি পিরিয়ডের গান নাকি ওখানে খুব চলছে, মানুষ শুনছে। আসলে আর নিজেদের জিনিস দিয়ে পেরে উঠছে না। আর ওরা তো আর কুমার শানুর হিন্দি গান গাইতে শুরু করতে পারে না। কিন্তু শুনছে। একটা ওভার প্রোডাকশন—অতি উৎপাদন ও বিপণনের জন্যও এটা হয়েছে। আগে একটা গ্রামোফোন রেকর্ডের দুটি গান—এপিঠে একটা, ওপিঠে একটা—এটুকু থাকত। পুজোর সময় একজন ভালো গীতিকার সুরকার ওই গোটা চারেক বা ছয়েক গান বাজারজাত করতেন। চারটের বেশি গান খুব কমই হত। আর আজকের দিনে একটা অ্যালবামে আটটি-দশটি বা বারোটি গান। আমারই তো দশ-বারোটা গান এক-একটা অ্যালবামে আছে। এখন আমাকে যদি কেউ বলেন আপনি আটটা গান আমাকে তৈরি করে দিন। তাহলে আমার ২ বছর সময় লাগবে। পুরোনো জমানো গান থাকলে সে আলাদা কথা। কিন্তু যদি বলে অনেক টাকা দিচ্ছি ৬ মাসের মধ্যে তৈরি করে দিন। এবার টাকাটা যদি আমার নিতান্ত দরকার হয়, যদি সেটা নিই, তাহলে গানগুলোও সেইরকম হবে।

সু : প্রসঙ্গটা আমরা এই বলে শেষ করব যে, আপনি আগে একবার বলেছিলেন, আমাদের অতীতের দিকে ফিরে তাকানোটাই প্রগতি।

সুমন : হ্যাঁ অতীতের দিকে যাওয়া, কথাটা অবশ্য আমার নয়। ইতালীয় সংগীতকার ভেরদি কথাটা বলেছিলেন। প্রাচীনের দিকে যাই—সেটাই হবে প্রগতি। ঠেকায় পড়ে আমরা কখনো-কখনো এরকম কথা বলি বটে, কিন্তু ওটা তো প্রগতি নয়। এখন যদি বলা হয় সিরাজদ্দৌলার যুগে যেভাবে ঘর-বাড়ি তৈরি করা হত, সেভাবে ঘরবাড়ি বানাতে হবে তাহলে তো খুবই মুশকিল। সংগীতের ছিরি-ছাঁদও তো পালটে গেছে, পালটাচ্ছে বেশ করেছে। কিন্তু পালটে কোন্ দিকে যাচ্ছে? আমি একটা দোকান দিচ্ছি। একটা গান বানানোও ওই দোকান দেওয়ার মতো, দেখতে হবে তাতে কি কি জিনিস রয়েছে। যদি একই জিনিস থাকে, নানান ধরনের উপাদান যদি না থাকে,তাহলে তো একই জিনিস প্রোডাকশন হবে। এবারে যাঁরা ভবিষ্যতে গান গাইবে—আমাদের নাতি-পুতিরা, তারাই বা কী করবে?

সু : যে-সমস্ত গান আপনি রেকর্ড করেননি অথচ তৈরি করেছেন বিভিন্ন সময়ে, সেইসব গানগুলিকে কোনোভাবে রেকর্ড করবেন বা আর কাউকে দিয়ে রেকর্ড করাবেন?

সুমন : এসবগুলো অন্য কেউ গাইলে তো আমি বর্তে যাই, কিন্তু গাইতে পারছে না তো। সত্যিই আমি বর্তে যেতাম। কুমার শানুর সঙ্গে আমার একবার আলাপ হয়েছিল। মানুষটিকে আমার দারুণ লাগে। সামান্য কণ্ঠশিল্পী ছিলেন, তারপর মুম্বাই গিয়ে সেখানে প্লে-ব্যাক সিঙ্গারের শাহেনশা বনে গেলেন, অন্তত বছর কয়েক তো থাকলেন। তা কথায় কথায় উনি বললেন, যে আমি আপনার গান গাইব। ওর জন্য আমি একটা গান লিখেওছি, ওই একটাই। এখন যদি উনি বলেন একটা অ্যালবাম, আমি পারব না-বলব, না করবেন না। তা যদি এটা করতে চাই, তাহলে সেটা কুমার শানুর মতো করে করতে হবে। আমার ধারণা কুমার শানুর মতো করে করলে উনি সেটা খুবই কমপিটেন্টলি করবেন, অন্যরা সেটা করতে পারছে না, বা পারবে না। ওনার সেই কমপিটেন্স আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ক'টা? ধরো আমার 'তিন শতকের শহর' কে গাইবে? অনেক শিল্পীই আছে, যাদের গাইতে বললে বলে, না সুমনদা আমি পারব না, তোমার মতো করে পারব না, বেঁকে বসে। ইন্দ্রনীল একবার একটা গান চেয়ে নিয়ে গেলেন, পরে উনি সেটা যা করলেন, আসলে উনি...যাক গে, উনি এখন যেটা

করছেন—রাজনীতিটা, এটাই ওনার সঠিক লাইন। এটাই উনি পারেন। যে গানটা গেয়েছিলেন—জ-ঘ-ন্য হয়েছে জঘন্য! তাই ঠিক করেছি আমিই করব, আস্তে আস্তে করব।

সু : আপনার 'জনতার হাতে-হাতে'...

সুমন : 'জনতার হাতে হাতে' রেকর্ড কোথাও হয়ে আছে, হয়তো গ্রামোফোন রেকর্ড হয়নি, কিন্তু কোথাও একটা আছে। ওয়েবসাইটে কোথাও আছে। আসলে জীবনের গত পাঁচটা বছর এদিক-ওদিক হয়ে গেছে। আর এখন তো বুড়োও হয়েছি। তবে করব, করব। 'জনতার হাতে হাতে'...ওই গানগুলো করব, বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এটা অনুষ্ঠান মতো করে করব।

সু : একসময় খুব গাইতেন 'আমি ভাড়া গুনেই বলি গানের মস্ত ইমারতে?

সুমন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, গানটা হারিয়েই গেল প্রায়, গানটা প্রায় ভুলেই গেছি। তারপর 'চাটুজ্যে তোর হাতঘড়িতে ঘুরছে সময়' খুব ইন্টারেস্টিং গান ছিল। তাছাড়া 'তবে যে বললে কিছু হচ্ছে না, ওই তো হচ্ছে' অসামান্য একটা গান, ওটাও রেকর্ড করা হয়নি। তাছাড়া 'তুমি গান গাইলে' ইন্দ্রনীল গেয়েছেন। অসহ্য রকমের খারাপ গাইলেন বেচারা। অন্যগুলো তবু সে তুলনায় ভালো গেয়েছেন, সেগুলো ওঁর জন্যই করেছিলাম।

সু : আপনার গাওয়া 'নাগরিক'-এর অ্যালবামে ওগুলো পাওয়া যায়। আমাদের প্রাইভেট সার্কুলেশনে আছে।

সুমন : কত গান আর রাখা যায়। কিছু আগে কসমিক মিউজিক-এর কিছু করে দিয়েছি, কত করব।

সু : এবার একটা অন্য প্রশ্ন করি। গানের ভিতরে আপনার—একজন মানুষ যদি ধরি— সেই মানুষের সচেতন প্রকাশ কতটা থাকে, আর কতটা মানুষটার শিল্পিত প্রকাশ। আসলে মানুষটার নিজের প্রকাশ নয়। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আপনার একটা গান ছিল 'দখল করার সাহস ছিল না, সাহস নেই, কোনো কিছুরই সাহস ছিল না, সাহস নেই।' অথচ, সাহস তো আপনার ছিলই। আমার প্রশ্ন গান কি আর-একজন মানুষকে শিল্পীর ভিতর থেকে বার করে আনে?

সুমন : হ্যাঁ, সেটা বিলক্ষণ পারে। ভিতরের একজন মানুষকে বের করে আনে। এছাড়া আরও একজন মানুষকে প্রকাশ করতে পারে, সেটা হচ্ছে আমারই অলটার ইগো। আমি একটা বাঙালি সত্তার প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলাম ওই গানটার

মধ্যে দিয়ে—'দখল করার সাহস'। দ্যাখো সব সত্য দিয়ে গান হয় না, সব সত্য শৈল্পিক উচ্চারণ না, আবার শৈল্পিক উচ্চারণ বলতে যা বোঝায়, সবসময় সেটা খুব বেশি বাস্তব হয় না। ধরো কালিদাসের গল্পটা, অন্য-এক কবির সঙ্গে লড়াই হচ্ছে। সামনে একটা শুকনো গাছ. কালিদাস লিখলেন অলংকারবহুল শব্দ দিয়ে বিরাট বাগাড়ম্বরপূর্ণ 'নীরস তরুবর' আর অন্য কবি লিখলেন—'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে'। দেখা গেল ওই কবি হেরে গেলেন। কেননা তাঁর কাব্যে গাল ভরা শব্দ নেই। আর বাগাড়ম্বরপূর্ণ কালিদাসের বাক্য হল কাব্য। এই যে কাব্যাদর্শ, তার বহুশত বছর পরে বুদ্ধদেব বসু মহাশয় প্রথম বললেন যে কালিদাসের বাক্যটা কাব্য নয় ওটা বাগাড়ম্বর, প্রকৃত কবিতা ওই 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে'-টাই। বাঙালিকে এই কবিতাটা তিনিই শেখালেন। কাজেই, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়, আমার যে কথাটা বলার আমি সেটা কতটা বলতে পারছি। আবার সেটাকে একটা ফর্মে আমাকে বলতে হবে। সেইখানে প্রশ্নটা হচ্ছে, আমি কতটা আনকম্প্রোমাইস, সিংহ কতটা অনাপোষী। আসল কথা, ঠিক কথাটা ঠিক ভাবে বলা। কবিতা বা গান কিন্তু আপস চেনে না, আমরা জীবনে আপস করে বাঁচি। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতায় গুন্টার গ্রাস বলেছিলেন, 'মানুষ আপস করে বাঁচে, কবিতা কিন্তু আপস চেনে না।' আমি ক্র্যাফটিং করতে গিয়ে উলটো-পালটা লিখে দিচ্ছি না, তার থেকে অনেক ভালো—লিখব না, ওই জায়গায় কম্প্রোমাইস করব কেন।

সু : আপনি অনেকরকম বিষয় নিয়ে গান করেছেন আমরা সবাই সেটা জানি। তবে একটা বিষয়কে আপনি পরিহার করেছেন বলেই আমার মনে হয়। যেমন বাংলা আধুনিক গানে একটি খুব শক্তিশালী বিষয় হল হারানো সম্পর্কের বেদনা বা বিরহ। আপনার গানে এ বিষয়টা আমি বিশেষ পাইনি। ওই 'বিদায় পরিচিতা' ও ওই ধরনের দু-একটি গান ছাড়া, আপনি পিছন ফিরে তাকাননি। আপনি কি ইচ্ছে করেই এটা করেছেন নাকি এটাই আপনি—

সুমন : এটাই আমি, এটাই আমি। একজন মস্ত নামকরা, গুণী প্যাথলজিস্ট, তিনি একটা অনুষ্ঠানে আমার গান শোনার পর—শিলিগুড়িতে—আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমাকে বললেন, আপনি মিলনের প্রেমের গান এত লিখেছেন, বিচ্ছেদের গান নেই? খুব ভালো প্রশ্ন। দ্যাখো এখন কে কীভাবে কোন বিষয় নিয়ে লিখবে এটা তাঁর ব্যাপার। বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে অঞ্জন গান লিখেছেন।

কিন্তু আজ এক্ষুনি বিচ্ছেদ নিয়ে একটা গান লিখতে হবে, এই ভেবে আমি কিন্তু লিখিনি কখনো। আমার মন কোনোদিন একটা বিচ্ছেদ, ছাড়াছাড়ি বা ওইরকম নেগেটিভ দিকে যায়নি।

সু : বিরহ রয়েছে, মানে কোথাও বিরহের একটা সুর রয়েছে আপনার একটা গানে—'সন্ধে হল'।

সুমন : ঠিক বলেছ, গানটাতে বিরহ রয়েছে ঠিকই, বিরহের সুর। গানটা শেষ হচ্ছে 'সন্ধে হল, সন্ধে হল তুমি আসবে বলো কখন।' কিংবা সাবিনার জন্য তৈরি করা—'রাতের ওপারে তারা অনন্ত দিশেহারা।/ইশারায় থেমে আছে যেন তুমি নেই কেন।' তুমি নেই কেন—এইটাই ছিল গানটার নাম— তুমি নেই কেন?

সু : 'রোববার' গানটার শেষ লাইনে হঠাৎ করে টার্ন নেয় বিরহের দিকে—

সুমন : ওটা বিরহের থেকে বেশি বিচ্ছেদের গান। খুব চেষ্টা করে কোনো বিষয়কে আমি শুরু করি না, শুরু হওয়ার পর সহজে যেদিকে যায়, আসলে গান তার নিজের জায়গা খুঁজে নেয়। এটা কীভাবে হয় আমি জানি না, এর রসায়নটা কী?

সু : অথচ আপনি স্মৃতিপ্রবণ। 'হয়ে ওঠা গান'-এ বাবা বসে বসে জাঁতিতে সুপুরি কাটছেন তালের মাথায় এরকম সূক্ষ্ম স্মৃতি আছে, কিন্তু জীবনের যে কেন্দ্রীয় সম্পর্কগুলো সম্পর্কের ওঠা নামা—এগুলো খুব বেশি আসে না, মানে সরিয়ে রেখেছেন। আচ্ছা আপনি কি বিরক্তিবোধ করছেন এধরনের প্রশ্নে?

সুমন : না-না, একদম না। বরং তুমি আর-একটু খোলাখুলি বললেই আমার বেশি সুবিধা হয়। তুমি কি নরনারীর শারীরিক সম্পর্কের কথা বোঝাতে চাইছ বা ওইরকম কিছু?

সু : না-না আমি ঠিক ওসব কথা বলতে চাইছি না, আমি বলতে চাইছি, আপনার ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেই এসেছেন, অনেক সম্পর্কের ভাঙা-গড়ার মধ্যে আপনার অভিজ্ঞতার জগৎ গড়ে উঠেছে। লেখালেখির ক্ষেত্রে কোথাও ওই ব্যক্তিগত জীবনটাকে সযত্নে সরিয়ে রেখেছেন। একটা হতে পারে আপনি এটা পরিহার করেছেন আপনার পরিচিত মানুষগুলোকে অস্বস্তিতে ফেলতে চান না বলে। আর-একটা হতে পারে মানুষের কাছে এটা একটা বাজে চর্চার বিষয়

হতে পারে। আবার হতে পারে এগুলো আপনার চিন্তাজগতের মধ্যে আদপেই নেই।

সুমন : চিন্তাজগতে আদপে নেই তা নয়, ধরো এস এম এস বলে একটা গান আছে। —'আদর শুধু এটুকুই এস এম এস।' ব্যাপারটা এই যে, আমি একটা বুড়ো ক্লাউন, কোনো এক রাজকুমারী একটা এস-এম-এস করেছিল শুধু 'আদর' এই বলে। এই নিয়ে গানটা চলছে, চলছে...'আদর শুধু এটুকুই পেতে পারি/বুড়ো সঙ আর কতটুকু পাবে জানেন রাজকুমারী।' শেষটা হচ্ছে—'আদর শুধু এটুকুই হল গান/রাজকুমারী তো রাজকুমারের সঙ্গেই চলে যান।' এটা আমার জীবনের একটা ঘটনা। আমি এরকম ব্যক্তিগত ঘটনাগুলোকে কোনো মিশন করে তুলিনি। জীবনে আমার বহু সম্পর্ক হয়েছে, বহু সম্পর্ক চলে গেছে। কিন্তু সেটাকে সেলিব্রেট করার মতো মানসিকতা আমার নেই। গান তো একটা সেলিব্রেশন, উদ্‌যাপন— 'ভালোবাসা শত যুদ্ধেও জেতা যায় না।' আমার যে প্রেম-প্রবণতা সেটা এই গানে এতখানি তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এরকম প্রেমের গান সারা পৃথিবীতেই খুব কম, খুব কম। 'বোকা বনে যাই বারবার তবু বলি/পায়ে পড়ি তোর প্রেমের গানটা বাজা'। এখন আলাদাভাবে হয়তো আমি প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কটাকে গানে আনিনি—আলাদাভাবে নেই, ধরো 'খোদার কসম জান আমি ভালোবেসেছি তোমায়'—এই গানটা কিন্তু একধরনের ব্যর্থতার গান। আমি যাকে চাই তিনি নবীন এবং 'এখন বয়স হল তুমি এলে বৃথা দিন গেল', কতদিন চলে গেছে তোমাকে ছাড়া, আমার যখন সময় ছিল তুমি আসোনি। আজ পুরুষ হিসাবে আমি তো সেই পুরুষটা নই, এই যে যন্ত্রণার জায়গাটা ওই গানটাতে এটা কিন্তু 'জাতিস্মর'-এ ব্যবহৃত গানটা নয়, ওটা সৃজিতের প্রয়োজনমতো লেখা, মূল গানটায় 'দ্যাখো জান ভালোবাসা প্রবীণের প্রলাপেতে ভরা'—এই গান কস্মিনকালে লেখা হয়নি। কবিতাও খুব কম, যে নবীনের সঙ্গে প্রেম এবং ব্যর্থতার যন্ত্রণা। সুপ্রিয়, আমি দুঃখ নিয়ে উদ্‌যাপন করি না 'তুমি ছিলে বেশ ছিল,' আবার 'তুমি আছো বেশ-বেশ-বেশ ভালো লাগছে' এরকম ঘটনাই তো বেশি ঘটে। আর তুমি আর-একটা কথা যে বললে অস্বস্তিতে না ফেলা, ওটাও ঠিক। লিখতে গেলে ডিটেল কিছুটা আসবেই। তাতে কেউ অস্বস্তিতে পড়বেন সেটা চাই না। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিয় এগুলো প্রেমেরই গান—'আমি তোমার পুরুষ না, আমি তোমার হ্যান্ডস্ আপ বাঁশুরিয়া' গানে যেমন আছে। ওইটাতেই তো আসল মজাটা।

সু : আর-একটা জায়গা। একটা সময় আপনার গান শেষ হয়েছিল 'মরব দেখে বিশ্ব জুড়ে যৌথখামার/হারিয়ে যেও না রক্তকিংশুক দিনের আশা'; আপনাকে কি বৃহত্তর অর্থে বামপন্থী বলব?

সুমন : হ্যাঁ আমি সাম্যবাদী, আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং মনে করি যে সমাজতন্ত্রই একমাত্র পথ। যে দেশে ধনী-দরিদ্রের এতখানি তফাত, বৈষম্য, যেখানে আমাদের দেশের শতকরা ৬০/৭০ ভাগ মানুষ মাথাপিছু সারাদিনে ২০টাকাও খরচ করতে পারেন না, তাঁরা খিদে নিয়েই ৩৬৫ দিন ঘুরে বেড়ান, সেখানে সমাজতন্ত্রই তো একমাত্র পথ বলে আমি মনে করি।

সু : তার রকমটা কি? যেগুলো আমরা practised হতে দেখেছি?

সুমন : এই একটা জায়গা, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমি তো অর্থনীতির কিছু বুঝি না, আমি স্বপ্ন দেখতে পারি, স্বপ্ন দেখাতেও পারি। তো, এই কথাগুলোই আমি লিখি। তার ফলিত কোনো দিক কী হতে পারে-না-পারে আমি ভাবতে পারি না। আফটার অল আমরা তো মানুষ, আমরা আমাদের দুর্বলতাগুলো কি সরিয়ে রাখতে পারব? কিন্তু মনে হয় যে চেষ্টাটা যেন থাকে।

সু : আমি এই কারণেই বলছি, যে আপনার সাম্যবাদী ভাবনা বা রাজনীতির গান যা শুনেছি, সেগুলো সবই তো নব্বই-এর আগে, সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার আগে। তারপর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙল, স্বপ্নগুলোও কি ধূলিসাৎ হল।...

সুমন : তুমি যেটা বলছ, সেটা খুব একটা নয়। কেননা নব্বই তো বটেই, নব্বই-এর পরেও আমার গানে ওই আশাবাদটা আছেই। ধরো এই 'ছত্রধরের গান' অ্যালবামটা, বা 'লালমোহনের লাশ' গানে এই সাম্যবাদ বা ওই সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা একইরকম আছে। আসলে আমি কোনোদিনই খুব তেড়ে-ফুঁড়ে সাম্যবাদ-জিন্দাবাদ কিছু কখনো করিনি। কিন্তু একটা গানে ধরো লিখছি 'একদিন হবে গণঅভ্যুত্থান;যেদিন আমার গানের ভাঁড়ারগুলো যাবে খুলে'—এটা যে সব গানেই থাকবে, তাহলে তো হবে না। সাম্যের যে জায়গাটা তুমি বলছ, সেটা আমি কখনও ছেড়ে দিইনি। তবে যেটা হচ্ছে, আমি তো পুনরাবৃত্তি পছন্দ করি না, একঘেয়েমিটা যাতে না আসে সবসময় সেটা দেখতে হয়। ফলে গান তৈরি করার সময় আমাকে ভাবতে হয় যে বিষয়হীনতাকে আমি কীভাবে ধরব। সেদিক থেকে আমি যে স্থির লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাব—এমন কোনো ব্যাপার আমার নেই।

সু : আপনি তো বিষয়হীনতাকেও বিষয় করেছেন।

সুমন : হ্যাঁ গান তো অনেকভাবে তৈরি হয়। ছোটোবেলার একটা ঘটনা, আমার মা আমাকে খুব বকাবকি করলেন, অফিসে বেরোচ্ছেন তখন ৯টার সময়। আমি কিছু উলটো-পালটা কোনো কাজ করছিলাম। তা প্রচুর বকুনি খেলাম, বকুনি খেয়ে মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রয়েছি। মা এরপর অফিস বেরোলেন, উঠোনে নেমে হঠাৎ ফিরে উঠোনের ওই জানালা দিয়ে একমুখ হাসি নিয়ে আমাকে বললেন, দ্যাখ ওখানে কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে। একটা টবের গাছে ফুল ফুটেছিল। এই ঘটনা থেকে পরবর্তীকালে গান লিখেছি। তো এইরকম জীবন আর ছোটো ছোটো তুচ্ছ ঘটনা, কথা—এগুলোই আমাকে গান দিয়েছে। আজকে কিন্তু আমি দেখছি যে, কত বছর ধরে, আমাদের যে নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাঁরা ক্লিশে হয়ে বেঁচে আছেন। আমিও প্রায় তাই। আমাদের গান প্রায় একরকম, কবিতাও তাই। ভাবনা-চিন্তা অবসর কাটানোর পদ্ধতি—সবই একরকম। সবাই মদ খাচ্ছি, সবাই হ্যা হ্যা করছি, কিছুই হচ্ছে না। ধরো এক ভদ্রলোক, তিনি সিপিএম করতেন, প্রকাশক ছিলেন, নামটা ভুলে গেছি। তিনি অকালে মারা যান। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় ৯১ সালে। একদিন তিনি আমাকে বলছেন, 'সুমনবাবু, আচ্ছা আপনার নিজের কী বলুন তো, মানে আপনার নিজের বলতে কী আছে। আপনি এত ভালো ভালো গান তৈরি করেন এগুলো কি আপনার নিজের? এগুলো তো আমাদের হয়ে গেছে।' কোনটা নিজের? দুপুরে আমরা তক্তপোষে বসে শুয়ে-শুয়ে গল্প করছি। 'গিটারটাও কি আপনার, আপনার নিজের? ওটাও কি আপনি কাউকে দিতে পারবেন না?' 'বলুন, তাহলে আপনার নিজের কোন্‌টা?' 'সেটা দিতে পারবেন না?' তখনও মেট্রোরেলের কাজ হচ্ছে, ময়দানের দিকটাতে মাটির ঢিপি করে রেখেছে, মাটি কাটা। আমাকে বললেন, 'ধরুন, একদিন বিকেল পড়ে আসছে, আপনি হাঁটছেন—গ্র্যান্ড হোটেল থেকে জাদুঘরের দিকে হেঁটে চলেছেন। আপনি পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের কাছাকাছি এসে হঠাৎ দেখলেন আপনার ডান দিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আপনি রংটা দেখে হতচকিত হয়ে গেলেন, দেখলেন ওই মাটির ঢিপির উপরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এই যে সুমনবাবু এইটাই আপনার, আপনার নিজের।' আমার ওই কথাগুলো ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। এই যে ঘটনা, আমার একটা গানে সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটা ধরে রেখেছি। 'নিজের বলতে এইটুকুই তো চলতে চলতে রাস্তা দিয়ে হঠাৎ দেখা সূর্য অস্ত।' এটা কিন্তু ওই

দাদার কথা থেকেই তৈরি হয়েছিল। সেদিন আমার এক নবীন বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল ওই পর্বত-আরোহী মেয়েটি ছন্দাকে নিয়ে। হঠাৎ একথা-ওকথার পর একটা লাইন এল—'পাহাড়ের মেয়ে। পাহাড়েই আছে শুয়ে।' এবং একটা গান এভাবেই বেরিয়ে এল। আমি এখনও ওটার সুর করিনি, সুর করব।

সু : যেসব প্রকাশিত গান, সেগুলোর সব ক'টারই সুর করেছেন—

সুমন : না-না, আমি অনেক গান লিখেছি, যেগুলোর সুর আমি করিনি। যেমন 'দখল করার সাহস ছিল না', 'রঙ্গন ফুল পোরো না চুলে'—এরকম অনেক-অনেক গানেরই সুর করিনি। সুর করতে গিয়ে মনে হয়েছে, দূর! সুরগুলো একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে।

সু : আর যেগুলোর সুর রয়েছে, সেগুলোর সব কি নোটেশন করে রাখছেন?

সুমন : না, নোটেশন আর করে রাখছি না, যখন থেকে ক্যাসেট রেকর্ডের ব্যাপারটা সহজলভ্য হয়ে গেছে। আমার যৌবনকালে নোটেশনটা করতাম।

সু : বাংলা খেয়াল নিয়ে আপনি কাজ করছিলেন।

সুমন : বাংলা খেয়াল আমার বাবার একটা আজ্ঞা বা নির্দেশ ছিল, রবীন্দ্রনাথের কিছু গান গেয়ে যাবি, আর তোর ভাষায় বাংলা খেয়ালের কিছু বন্দিশ রচনা করবি। বাবার কথা আমাকে খুব ভাবিয়েছে। বাংলা খেয়াল নিয়ে একসময় আমি চেষ্টা করেছি, হয়েছে, কিন্তু সে চেষ্টা অঙ্কুরে বিনষ্টও হয়েছে। খেয়ালের কথাগুলি কিন্তু পাঞ্জাবি, হিন্দি বা ব্রজবুলি—সে কথারই মতো। অর্থাৎ ধরো মধুমন্তী, আচার্য চিন্ময় লাহিড়ীর গাওয়া একটা গান আছে 'দুয়ারে এল কে সখী রে' (১ কলি গান গেয়ে), তো এগুলো খেয়ালের বন্দিশ, রাগপ্রধান হিসেবে চলছে বটে, তার এটা খেয়াল আঙ্গিক। তেমনি ধরো সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটা গান আছে (গান গেয়ে) 'ময়ূরী নাচে আজি 'বোল-রে পা-পি-হা-রা' মিয়াকি মল্লারের ওপরে, কিন্তু যেটা বলার ওই গানটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেয়াল হিসেবে ইলাবরেট করেনি, ওইখানেই থেমে গেছে। মনে হয়েছিল হ্যাঁ খেয়ালটা করা দরকার। তবে একটা সময়, আমি আমার গুরু, যিনি না হলে আমার রাগসংগীতের কোনো ধারণাই হত না, সেই গুরু কালীপদ দাস মহোদয়ের পা ছুঁয়ে আমি বলতে বাধ্য হই, এই গানের কথা আমি আর নিতে পারছি না। আমায় ক্ষমা করুন। সময়টা ১৯৭৪ সাল। এ যে কী কথা আমি খেয়ালে বলছি, গাইছি, কথাগুলো আমায় যেন কিছু বলছে না, শেষকালে বিরক্ত হয়ে ইংরেজি কথা দিয়ে গাইতাম। মাস্টারমশাই সেটা বুঝেছিলেন, বলেছিলেন হ্যাঁ সুমন,

তুমি ঠিকই বলেছ, বুঝতে পারছি তুমি আর পেরে উঠছ না। ১৩ বছর উনি আমাকে গান শিখিয়েছিলেন। খেয়াল হিসেবে পরে আমি দু-একটা গান তৈরি করেছিলাম। এ নিয়ে আমি কাজ করছিলাম, এখনও করি। মাঝে মাঝে মনে হয় কী হবে, কেউ তো শুনতে চায় না। এখন আমার ক্লান্ত লাগে আর কত গান করব। আমি একাই তো করেছি। তবে এখনও খেয়ালই গাই, খেয়াল নিয়েই আছি। বন্দিশের বদলে এখন সরগম করে গাই, ফুলস্কেলে গাই। বাংলা খেয়াল করার তাগিদ আর অনুভব করি না, আমি ২-৩টে খেয়ালের অনুষ্ঠানও করেছি, দেখেছি কোনো শ্রোতা নেই। আমার যারা শ্রোতা, তারা কেউই রিঅ্যাক্ট করে না। শ্রোতাদের মধ্যে কোনো হেলদোল যেন নেই।

সু : শ্রোতাদের তো খুব ভিড় থাকে!

সুমন : হ্যাঁ ভিড় থাকে ঠিকই, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখি না। কেউ এসে কোনো কৌতূহল বা প্রশ্ন জানায় না। এমনকি কেউ এসে বলেও না যে আমি বুঝতে পারলাম না, জানতে চাই, আমাকে বুঝিয়ে দেবেন—এমনটা হলেও তবু বুঝতাম। কাজেই আমাকে যারা ভালোবাসেন, আমার গান শুনতে যারা ভালোবাসেন, তারাই সব—এই আর কি!

সু : এই যে জিজ্ঞাসা করছেন না, সেটা হতে পারে যে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছেন।

সুমন : না-না, সেসব কিছু না। তারাই তো আবার আমাকে গালগাল দিতে ভয় পান না।

সু : একটা অন্য প্রশ্ন করি, আপনি তো দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন, এই পেশায় যখন আপনি ছিলেন খুবই সিরিয়াস কাজ করেছেন। সেই সাংবাদিকতার যে মন, যে মেজাজ সেটা কি কোনোভাবে গানের মধ্যে এসেছে?

সুমন : হ্যাঁ, আমি সাংবাদিকতার সঙ্গে গানকে মিলিয়েছি। একদিকে ঘটনা ঘটছে, সেই ঘটনাকে নিয়ে গানও লিখেছি, অদ্ভুত সব গান, সেখানে আমার কমেন্ট, আমার মন্তব্যও গানের মধ্যে এসেছে। আর লেখ্য সাংবাদিকতা আমি এই তো সেদিনের বর্তমান সরকারের সময়েও করেছি। প্যারডির মতো গান, বা সম্পূর্ণ নতুন গান, কেলানি ঘাতুনের মতো গান। কলম লিখেছি 'মন-মেজাজ', বই হয়ে সেটা বেরিয়েওছে। আবার সুমনামি, যদিও গানের উপরেই, ওটাও একধরনের সাংবাদিকতাই। কিন্তু আমাকে তো কেউ কিছু করতে বলে না, কিছু করতে বললে ভালো লাগে। নিজে নিজে আর কতটা-কী করা যায়! হ্যাঁ একাও চেষ্টা করেছি। আমার ওয়েবসাইটে 'দাম স্পেক মকবুল'—ওটাও একটা সাংবাদিকতা।

সু : সাংবাদিকতাটা কি আপনার ভিতরের জিনিস, যেমন গানটা, নাকি ওটা বাইরের জিনিস নিছক পেশা?

সুমন : না-না, ভিতরের। আমি খুব সানন্দেই সাংবাদিকতা করেছি। আজ যেটা মনে হয়, যা করছি, লিখছি একধরনের সাংবাদিকতাই। তবে বয়স তো অনেক হয়েছে। আজ আর-একটা ঘটনাপ্রবাহের উপর কলাম লিখব, সেই মতটা আলাদাভাবে প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে না।

সু : সুমনদা আপনার কি কখনও এমন মনে হয় যে আপনি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। মানুষ এখন আপনাকে—আপনার মতো এত খ্যাতিমান, এত খবরের শিরোনামে থাকা একটা মানুষ, সেটা রাজনৈতিক বিরোধী মতের কারণেও হতে পারে—ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক, মানুষ আপনাকে এড়িয়ে চলে। কোথাও কি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, এরকমটা মনে হয়?

সুমন : না-না, এই ভয়টা আমার একদম নেই। একেবারেই নেই।

সু : আসলে মধ্যবিত্ত মানুষ যেগুলোকে ভয় পান, এড়িয়ে চলেন—

সুমন : দ্যাখো, আমি প্রচুর লড়াই করেছি। অল্প বয়স থেকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি, অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের জায়গা করে নিয়েছি। একাধিকবার বিদেশেও চলে গিয়েছিলাম। সাংবাদিক হয়েছি, ভাষা শিখতে হয়েছে, এত কিছু করেছি যে ভয়-টয় আর নেই। মধ্যবিত্তের যে ভয়গুলো রুল করে—

সু : ইনসিকিউরিটি—

সুমন : ভয় বলো বা ইনসিকিউরিটি—একটাই কখনো-কখনো হয়, সেটা আর্থিক—যে একটা বড়ো অসুখ হল কি হবে? তবে সেটা খুব কিছু না। আমি খুব বেশি চিন্তাভাবনা করি না। অনেক কিছু থেকে স্বেচ্ছায় সরে এসেছি। গুজব হচ্ছে এই যে, অধীর চৌধুরী আমাকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য বলেছেন। কথাটা সত্যি নয়। কিন্তু আদৌ যে কেউ এরকম অ্যাপ্রোচ করেনি, তা তো নয়। অধীর চৌধুরী, দিগ্বিজয় সিং কিংবা রাহুল গান্ধি নয়, নবীন কোনো কর্মীকে দিয়ে এমন অ্যাপ্রোচ করা হয়েছিল। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে রাজ্যসভায় আমি যেতে আগ্রহী কিনা। আমি যাইনি। তেমনি এম. পি. হিসেবে কিছু ক্ষমতা তো থাকে, আমার সেই ক্ষমতার লালসা নেই, আগ্রহ নেই। আমি খুব অল্পে সন্তুষ্ট। আমাকে যেটা বিব্রত করে বেড়ায় বা তাড়া করে বেড়ায়, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কোনো একটা বড়ো যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে—মিউজিক সফটওয়্যার—

মিউজিক মেকিং ডিভাইস—সেটাকে পাওয়ার একটা লোভ—লোভটা আমার আছে ওই মিউজিক সফটওয়্যার-সংক্রান্ত। লোভটা কিন্তু একদম ফোকসড। এখন ধরো মাখনের মতো বাজবে কোনো একটা গিটার—এমন স্বপ্নও আমি দেখি না। এরকম একটা গিটার হয়তো পেলে মন্দ হত না, বাজাচ্ছি এই বুড়ো বয়েসে আঙুলগুলো দিয়ে বাজাচ্ছি, আর্থারাইটিস থাকা সত্ত্বেও একটুও যন্ত্রণা হচ্ছে না—এরকম একটা গিটার আমি লাখ দেড়েক দিয়ে কিনতেই পারি। কিন্তু আমি ২০ হাজার টাকার গিটারেই চালিয়ে নিতে পারি। লোভ যদি থাকে ওই মিউজিক সফটওয়্যারের উপর।

সু : আসক্তি?

সুমন : আসক্তি?...সিগারেট ছাড়া আর কোনো আসক্তি নেই আমার।

সু : আপনার লেখায় বা গানে মধ্যবিত্তের, মধ্যবয়স্ক অ্যাভারেজ বাঙালির যে জীবন, তার চাওয়া-পাওয়াগুলো, ধরুন পরিবারের নিরাপত্তাটা সেই মানুষ যেভাবে চান, পঁষষট্টিতে পৌঁছে তিনি যেভাবে নিরাপত্তাটা চান, আপনি কি এই অ্যাভারেজ বাঙালির বাইরের মানুষ?

সুমন : না-না, আমি এসবের সম্পূর্ণ বাইরের মানুষ। তবে এখন যেমন ডাক্তার বলে দিয়েছেন, আমার একা থাকা একেবারেই চলবে না। তো এখন আর একা থাকি না। কোনো-না-কোনো নবীন বন্ধু আমাকে রাতটুকু সঙ্গ দেন। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সুপ্রিয়, এই জিনিসটা হয়েছে যে আমি একটু পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। একটা সাপোর্ট হলে মন্দ হয় না। আগে আমি সাংঘাতিক স্বাবলম্বী ছিলাম, কেউ আমার জন্য কিছু করে দিচ্ছে ভাবলেই রেগে যেতাম। এখন মনে হয়, আহা-রে, কফিটা যদি কেউ বানিয়ে দিত, তোয়ালেটা যদি এনে দিত বড়ো ভালো হত। এটা ছাড়া আমার আর কোনো সাপোর্ট বড়ো বেশি প্রয়োজন নেই। বরং মানুষের সঙ্গ যত দিন যাচ্ছে—অসহ্য হয়ে যাচ্ছে। আড্ডা আমার কাছে অসহ্য একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। জীবনের অনেকটা সময় এত মানুষের কথা শুনেছি, বক্ বক্ করে এতটা সময় আমি নষ্ট করেছি, আজ আর কথা শুনতে বা বলতে আমার ভালো লাগে না। মানে মানুষের সংসর্গ আর আমার ভালো লাগে না। কাম আমাকে আগে যতটা প্রলুব্ধ করত, এখন আর ততটা করে না। কিন্তু কামহীন আমি নই, এখনও নই। কামের প্রয়োজন আমার নেই তা নয়, প্রয়োজন আছে। আগে হই-হই রই-রই করে ভিতর থেকে যে একটা

তাগিদ ছিল, সেটা অতটা বোধ করি না; কিন্তু কামটা পরিপূর্ণভাবেই আছে। প্রিয় কোনো মানুষের মুখ দেখলে সবারই ভালো লাগে, কিন্তু কথা, গল্প—সেটা আর ইচ্ছে করে না, বরং সময়ে আমি চার লাইন একটা বই পড়লাম, সুর লাগালাম গানে—এইটা ইচ্ছে করে বেশি। আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে—এই বোধটা আমার বড্ড মনে হয়। আমার সময় বেশি নেই। এই সময়টা তাই নিজের মধ্যে কিছু করি। আমি যদি ইমন রাগটা ভালো করে গাইতে পারি, সেটা বেশি ভালো লাগবে।

সু : আমরা বেশি করে ভাবি আমাদের চারপাশটা নিয়ে, আমাদের সমাজ, রাজনীতি— এগুলোর মধ্যেই তো বাঁচি, সময়ের মধ্যেই বাঁচি। আমাদের এই বাংলা, যেখানে এত ধরনের ঘটনা সেই দেশভাগ থেকে একের-পর-এক আঘাত, রাজনৈতিক অস্থিরতা ঘটে চলেছে। আমার প্রশ্ন, একজন প্রবীণ সাংবাদিক হিসেবে এই রাজ্যটার ভবিষ্যৎ কোনদিকে যাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

সুমন : আমার মনে হয়, এটা একটা অদ্ভুত নৈরাজ্য, মাৎস্যন্যায়! আমেরিকায় একটা কথা তৈরি হয়েছিল আটের দশকে—'মি সোসাইটি'। আমি বানিয়েছিলাম 'আমি সে ও সখা-সমিতি'। এখন যেটা হচ্ছে 'আমি' আর আমার চেয়েও বেশি আমার ছেলেপুলেদের একটা চাকরি হলেই চলে। কিন্তু এম. পি হিসেবে কাজ করতে গিয়ে একটা জিনিস উপলব্ধি করেছি যে, আমি তৃণমূলের টিকিটে জিতেছি বটে, কিন্তু আমি এম. পি হিসেবে সবার। এই বোধটা কিন্তু এখন নেই। সি পি এম-এর আমলে যেখানে তৃণমূলের সমর্থক বেশি সেখানে কোনো উন্নয়ন হয়নি। আমি সেটাকে ভেঙেছি, ভেঙে আবার দোষের ভাগীও হয়েছি। এই যে পুকুরগুলো শুকিয়ে গেছে, জল নেই, এটা তো একটা ভাবনা। তোমাকে একটা উদাহরণ দিই। আমি যখন ভোটে দাঁড়িয়ে ভোটের প্রচার করতে প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরছি, সেগুলো এত দূরের যে ফিরে এসে শহরে মিছিল করতে পারতাম না, গ্রামের কোনো বাড়িতে দাওয়ায় বসে বা শুয়ে কাটাতাম। আর আমি বসলেই পাড়ার বউ-ঝি, যুবতী-বৃদ্ধা সবাই এসে নিরাপদ একটু দূরত্বে বসতেন। বয়স্কাই বেশি। আমাকে দেখতেন তাঁরা। আমি সব জায়গাতেই তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি, যে দিদিরা, মায়েরা—আমি যদি জিতি তাহলে কোন্ কাজটা আগে করব। তো তাঁরা আলোচনা করে আমায় বলতেন—বাবা

যদি জেতো তাহলে পুকুরগুলো সংস্কার কোরো। বিশ্বাস করো সুপ্রিয়, সবগ্রামেই ওই একই কথা—পুকুরগুলো সংস্কার কোরো। তো আমি জেতার পর, পার্টিতে যখন বললাম, পার্টি আমার কথাকে কানেই নিল না। আমার মনে আছে, তৃণমূলেরই এক কর্মীর বাড়িতে মিটিং হচ্ছিল, তখন বাইরে স্পিকার লাগিয়ে মিটিং করা যাচ্ছে না। সেই বাড়ির কিশোর একটা ছেলে এসে আমাকে বলছে—'জেঠু তোমার মিটিং হয়ে গেলে আমার সঙ্গে একটু আসবে?' আমি বললাম, 'কোথায়'? বলল 'এইখানে।' তো মিটিং শেষ হতেই ওই কিশোর এসে আমার হাতটা খপ্ করে ধরে টেনে নিয়ে চলল—বলল, জেঠুকে নিয়ে আমি একটু যাচ্ছি, এখনি ফিরে আসব। ছেলেটি ক্লাস এইট-নাইনে পড়ে। আমাকে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেল, চোখে দেখতে পাচ্ছি না। তো ছেলেটি আমাকে নিয়ে গেল একটা পুকুর পাড়ে। বলল, আর এগিয়ো না। বলল, জেঠু তুমি যদি ভোটে জেতো, তাহলে পুকুরটাকে দেখো, এটাকে বাঁচিয়ে তোলো। ছেলেটি কোনো ক্রিকেট ব্যাট কিনে দিতে বলেনি। এ-তো আমি আমার দেশের মানুষের কাছেই শুনেছি। এই যে কনসার্নটা আমার দলের নেতা-নেত্রীরা—মমতা ব্যানার্জিও কানেই তুলছেন না। তিনি একটা অর্ডার দিলে অনেক কাজ হয়। তিনি আমাকে বলছেন কবে 'গিটার শেখাবে বলো'। ফলে এ দেশে কী হবে? আমরা যাদের পেয়েছি, তাদেরই যোগ্য, আমরা বিদ্যাসাগরের যোগ্য নই। সাধারণ মানুষ তো অসহায়, তারা কী করবে! তাদেরকে জোর করে ভোট দিতে বাধ্য করবে, না হলে মার খাবে। সি পি এম-এর আমলেও গায়ের জোরে ভোট হয়েছে, তৃণমূলের আমলেও হয়েছে। এম. পি সাহেব বুক ফুলিয়ে সে কথাটা বলছেন, হ্যাঁ জোর করে ভোট করেছি, বেশ করেছি। সাধারণ মানুষের প্রজ্ঞা আজও আছে, থাকবেই, কিন্তু অ-সাধারণ মানুষের কাছে সেটা পৌঁছোচ্ছে না। ফলে নৈরাজ্য-নৈরাজ্য-নৈরাজ্য—এটা ছাড়া কিছু তো নেই। সি পি এম-এর আমলে যেভাবে নন্দীগ্রাম, লালগড় হল তারই ফলে তো পরিবর্তন হল। নন্দীগ্রাম লালগড় না হলে সেটা হত না। অত সহজে হত না। ঠিক সেইভাবে যদি কোথাও একটা লড়াই হয়, আলোড়ন ওঠে, লোকে লড়াই করে তাহলে আবারও পালটে যাবে। কিন্তু সি পি এম-এর আমলে ওই অত কিছুর পরে মমতা সরকার তৈরি হয়েছিল, তারা তো স্বৈরাচারের পথেই রইল বা রয়েছে। তাহলে কি আবারও ওই পরিবর্তনের

পর আর-একটা নৈরাজ্য, সেইরকম কিছুই থাকবে? আমি তো খুব আশা কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

সু : আপনি তো সারাজীবন গোটা বিশ্বের ঘটনাবলী কিংবা দর্শন সবকিছুর সঙ্গেই নিজেকে মিলিয়েছেন—আপ-টু-ডেট থেকেছেন। সাংবাদিক হিসেবেও আপনাকে অনেক বেশি করে আপ-টু-ডেট থাকতে হয়েছে। সারা পৃথিবীর নিরিখে ভাবনার চিন্তার যে জগৎ, আপনাকে কি নাড়া দেয়?

সুমন : আজকাল খুব একটা আর নাড়া দেয় না, খুব একটা আর খবর রাখছি না। আজকাল সভ্যতা যেন অনেকটা ক্লান্ত হয়ে গেছে। আগে সভ্যতার একটা অস্থিরতা ছিল, জ্বালা ছিল। চৈত্রমাসে যে রোদ্দুর এসে গায়ে পড়ে, সভ্যতার গায়ে সেভাবেই আলো ঝিকমিক করত। সভ্যতা আগে আমাদের ঘাম ঝরাত, ছটফট করাত, অস্বস্তিতে রাখত, সেই সভ্যতা ক্লান্ত। আজকে আমাদের ভি এস নইপল লেখা থেকে রিটায়ার করলেন, বললেন যে মানুষ আর সিরিয়াস লেখা পড়তে চায় না। সিরিয়াস লেখা ক'জন আর লিখছেন, ক'জন আর পড়ছেন? আমার অসামান্য লাগে 'দ্য হোয়াইট টাইগার'। একজন ভারতীয় যুবকের লেখা, বুকার প্রাইজ পেয়েছেন। অরবিন্দ আদিগা। চমৎকার! কী ক্রিটিক্যাল লেখা। তার মধ্যে থেকে কত কী বলে দিচ্ছেন। কিন্তু কই এই বইটা ক'জন পড়ছে? ধরা যাক অরুন্ধতীর রায় Broken Repuplic কী অসামান্য ক্রিটিক্যাল লেখা তাঁর, কালক্রমে অরুন্ধতী এমন অসামান্য জায়গায় এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু ক'জন পড়ছেন, ক'জন শুনছেন তাঁর কথা! আর এই বাংলাই পড়াশোনার দিক থেকে সবচেয়ে অগা! এখন বাইরে, কোথায় কি হচ্ছে—আমি যখন বিদেশে থাকতাম তখন পৃথিবীর খবর কত সহজে পেতাম, আজকে আমাকে বহু মেহনত করে সেটা পেতে হবে। সেই সময়টা আজ আর আমার দিতে হচ্ছে করে না, এই সন্ধানে নয়।

সু : তার মানে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে আপনি পঁয়ত্রিশের যুবকের মতো করে তাকাতে পারছেন না, সামনের সময়টা—

সুমন : কোন্ মুখে বলি (হাসি) প্রাণীদের যখন দেখি একটা কুকুরছানা রাস্তায় একা-একা খেলা করে চলেছে, যখন দেখি পাখিরা তাদের কাজ করে চলেছে, গাছ আগের মতোই বাড়ছে সেটা হয়তো আমার কাছে অনেক আশার কথা হয়ে ওঠে। তখন মনে হয়, আমরা ভারত বা বাংলাদেশ বা পাকিস্তান কি আমেরিকা বা

অন্য কোনো দেশ—আমরা হয়তো কিছু করতে পারব না। কিন্তু প্রকৃতিতে এত প্রাণ আছে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ১টা কবিতায় আছে 'মরে না দুরাশা তবু মনে হয় এ নিঃস্ব জগতে/এতখানি অপচয় ঘটাবে না বিধি কোনোমতে।' আমি আনন্দ পাই এই প্রকৃতিকে দেখে, গাছের রং পালটায়, রোদ্দুর এসে পড়ছে, দিনের রং পালটাচ্ছে, মানুষ হাসছে খেলছে। একটি দেহাতি মেয়ের স্বামী এগিয়ে পড়েছে। রাস্তা ক্রশ করতে গিয়ে বর হারিয়ে গেল, ছেলে কোথায় এগিয়ে গেছে, বউ মাঝপথে দাঁড়িয়ে, খিলখিল করে হাসছেন। বাসের ছাতে চুবড়ি তুলতে চাইছেন, ২-৩ জন বিহারি মানুষ। কন্‌ডাক্টর তাদের তুলতে দেবে না, জোর করে নামিয়ে দিচ্ছে, আর ওরা ২টো চুবড়ি পিছনে তুলে ফেলেছে। এমন সময় বাসটা ছেড়ে দিয়েছে, আর দু'জন বাসটার পিছনে ছুটছেন চুবড়ি ২টো নামাবেন বলে। আর দু'জনে পপাত ধরণী তলে। তা পড়ে গিয়ে তাদের সে কী হাসি, হইহই করে হাসছেন। গড়িয়াহাটার মোড়ে এক শীতের সকালের শুরুতে দেখেছি সুন্দর রোদ্দুরে এক রিকশাওয়ালা গামছাটা কোমরে বেঁধে নিয়ে রাস্তার মধ্যে বোলিং করার ভান করছেন, ভঙ্গি করছেন। তার আশেপাশে জনজীবন, ব্যস্ত জনতা চলেছে নিজের তালে। তিনি কোনোদিকে তাকাচ্ছেন না, ভ্রূক্ষেপ নেই। এই যে জীবন—গান শুনে, বই পড়ে বা নাটক দেখে নয়, ফিলম্ দেখে নয়—জীবনটাকে যখন এভাবে প্রত্যক্ষ করি, তখন মনে হয় যে আশা আছে। জনজীবনের মধ্যে, আমজনতার মধ্যেই কিন্তু ওই প্রাণটা আছে। আর বাঙালি বা ভারতীয় মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত নাগরিক, —যারা নাটক করছেন বা ছবি আঁকছেন বা গান গাইছেন—তাঁদের মধ্যে?—না, না, না, একদম না, তাঁদের মধ্যে নয়। জীবনকে খুঁজতে গেলে ওই ফুটপাথে ওই আমজনতার মধ্যেই খুঁজতে হবে। আশা তাঁদের মধ্যেই আছে। আমি সকালবেলা হাঁটতে যাই, দেখি দূর থেকে একটা ইঞ্জিন লাগানো ভুটভুটি ভ্যান আসছে, সবজি বোঝাই ভ্যান। হয়তো সেটা বহুদূর থেকে—বারুইপুর থেকে বা সোনারপুর থেকে আসছে সবজি নিয়ে। লোকটির একমুখ হাসি, আমাকে চিনতে পেরেছেন বোঝা গেল, হয়তো তাঁদের ওখানে আমি গেছি। উনি আমাকে মনে রেখেছেন। এখনও এটা আছে। আমি এক ভদ্রলোককে চিনি, তাঁর নাম অনিল দে। তিনি একটি কলেজে পড়ান। রোজ সকালে তিনি একটা থলিতে করে বিস্কুট নিয়ে এইখান থেকে নাকতলা অব্দি রাস্তার যত কুকুর

আছে সবাইকে বিস্কুট খাইয়ে বেড়ান, খাওয়াতে খাওয়াতে যান। কুকুরগুলোর সঙ্গে গল্প করেন। তাদের গায়ে চাপড় মারছেন। জীবন তো ওখানেই। ওনাদের যখন দেখি, মনে হয় সত্যিই আশা আছে। হারিয়ে যায়নি, সত্যিই আশা আছে। ওঁদের মধ্যে আশা আছে।

সু : আপনার Television-এর Reality Show-তে দেখছি দুরূহতম গান, প্রাতঃস্মরণীয় শিল্পীদের গান, ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা চমৎকার গেয়ে দিচ্ছে—অথচ, আপনি বলছেন গান বাঁচছে না—

সুমন : আমার নিজের যখন গলা ভাঙেনি, ওই বয়ঃসন্ধির আগে পর্যন্ত, গান আমি ম্যাজিকের মতো গেয়ে দিতাম। গলা ভাঙল, একটু বয়স বাড়ল, তখন আর পারি না। ছোটোবেলায় এরকম ট্যালেন্ট অনেক পাওয়া যায়, যারা অদ্ভুতভাবে গেয়ে দেয়। মিউজিকেই এটা পাওয়া যায়, লিটারেচারে এটা তুমি পাবে না। আর মিউজিকে যাদের তুমি এইরকম ট্যালেন্ট দেখবে, তারা বড়ো হলে দরকচা মেরে যান। শিশুশিল্পী ছিলেন কুমার গন্ধর্ব। তিনি নাকি বড়োদের আসরে কোলে বসে খেয়াল গাইতেন। মাইক্রোফোনে গলা পৌঁছত না বলে উঁচু জায়গায় বসাতে হত। পুরোদস্তুর খেয়াল গাইতেন। কিন্তু যত দিন গেল, তিনি বড়ো হলেন আর ততই তিনি পিছিয়ে পড়লেন। এইরকম শিশুশিল্পী মাস্টার অমুক, মিস অমুক—এরকম আমরা অনেক পাই, তারপর তাদের আর দেখা যায় না। আমি ছোটোদের দিয়ে কাজ করে দেখেছি, আমার মুখ দিয়ে বেরোনো মাত্র গানটা তারা তুলে ফেলল। পরে সেই তাদেরই গান গাওয়াতে গিয়ে দেখেছি—কিছুই অবশিষ্ট নেই আর।

সু : এটা কি টেকনিকের অভাব নাকি অন্য কিছু?

সুমন : না-না, এটা টেকনিকের ব্যাপার নয়, এটা শারীরবৃত্তীয় ব্যাপার। একটা বয়সে এটা সম্ভব হয়। এটা স্বাভাবিক। মদনমোহনের গান সে অনায়াসে গেয়ে দেয়। কিন্তু 'তোমার হল শুরু' গাইতে দাও—পারবে না বা গাইবে না। আসলে তার নিজের পছন্দটাও কাজে লাগছে। বাড়িতে গিয়ে শুনছে। শুনে শুনে ধাঁচাটা তৈরি করে নিয়েছে। হঠাৎ করে ওই ধাঁচাটা গলায় এসে যায় তাদের। রিহার্সাল করে, কিন্তু দু-একটিই। আমাকে হেমন্তবাবু বলেছিলেন, 'আমি অমুকের গান শুনলাম, সে তো আমার গান গেয়ে একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছে।' লোকটি খুব বিখ্যাত ছিলেন না, তবে হেমন্তবাবুর গান গেয়ে খুব নাম করেছিলেন। তা

হেমন্তবাবু বললেন—'নতুন গান দিলাম তাকে, আর গাইতে পারে না।' ফলে যিনি মদনমোহনের 'দিল যো না কহ সকা' গেয়ে শুনিয়েছিল, তাকে তুমি যদি একটা নতুন গান তৈরি করে দাও, দ্যাখো সে আর গাইতে পারছে না। আসলে পার্টিকুলার একটি জিনিসই সে ঠিকঠাক কপি করতে পারে সেটা হয়তো মদনমোহনের গান। আর কিছু না। ওই বয়সটা পেরিয়ে গেলে সেটাও আর হবে না।

সু : গায়কদের ক্ষেত্রে আপনি যে অভিজ্ঞতার কথা বললেন, যন্ত্রশিল্পীদের ক্ষেত্রে কি ঠিক এর উলটোটাই হয়েছে? মানে এখন তো প্রায় পাড়ায় পাড়ায় যন্ত্রশিল্পী ছড়িয়ে আছে, মোটামুটি তারা তো বাজাচ্ছে।

সুমন : কী বাজাতে পারে তারা?

সু : ধরুন কি-বোর্ড...

সুমন : কি-বোর্ড বা গিটার তো?

সু : হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই।

সুমন : ধরো আগে ছিল এমনটা—'খর বায়ু বয় বেগে' গাইছ, অন্তরা যাবার আগে তুমি ছেড়ে দিলে, নিজের মাথা খাটিয়ে বাজাতে হবে—একজনও না, আজকের দিনের কথাই বলছি। তাদের কোনো প্রতিভাই নেই। মাথা খাটানোর মতো কিস্যু তাদের ক্ষমতা নেই। ইমনের উপরে রবীন্দ্রনাথের একটা গান, সে মাঝখানে অন্য কী সব বাজাচ্ছে। জানেই না কিছু। এবারে ফাংশানে হিন্দি গান, বা ধরো—'তোমার দেখা নাই রে' দাও। সেইটা সে অনায়াসে বাজিয়ে দেবে। কাজের কাজ তো কিছুই হচ্ছে না। বড়ো বড়ো শিল্পী, যাঁরা প্রথিতযশা, যাঁদের নাম আছে, প্রচুর ছাত্রছাত্রী আছে, আমার সঙ্গে অনুষ্ঠানে বাজাতে এসেছে, দেখছি তারা বাজাতে পারছে না। **filler** দিতে পারছে না বা কোন্ টাইপের গানের সঙ্গে কীরকম ইন্টারল্যুড হবে—গানটা যদি পল্লিগীতি হয়, তাহলে কেমন হবে? গানটি যদি রাগসংগীত হবে—তাহলে কেমন হবে? গানটা যদি যদি হয় আধুনিক ইডিয়মের উপর তাহলে কেমন হবে? পারছে না—এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার অনুষ্ঠানে আমি কাজী নজরুল ইসলামের 'মোরা ঝঞ্ঝার মতো' উদ্দাম গাইছি। বাজাচ্ছেন একজন ড্রামার একজন অল্পবয়সি কি বোর্ড-প্লেয়ার তিনি বেস বাজাচ্ছেন, আর-একজন গিটার—ইলেকট্রিক গিটার। তার আগে একটা রিহার্সাল করতে গিয়ে দেখলাম এঁরা কিস্যুই জানেন না।

এঁরা টিপিক্যাল কিছু ইংরেজি পপ্ সঙের কিছু কিসিম শিখেছে, সেটাই সে বাজাচ্ছে খালি। সবাই তাই। কলকাতায় একবার বিখ্যাত গিটারিস্ট, আর-একজন ড্রাম্স্ শিল্পী একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে। 'ও গানওলা, আর একটা গান গাও'—গানটা আমি গাইছি। যিনি ড্রাম্স্ বাজাচ্ছেন, তিনি দেখলাম ঠেকাটা একটু নিয়ে নিলেন। আমার এক বন্ধু বিশিষ্ট শিল্পী বেস বাজাচ্ছিলেন, মারা গেছেন—আমি বললাম, এই তোমরা একটু মাঝখানে বাজাও। দেখি ধরতেই পারছে না স্কেলটা। শুধু ইংরেজি পপ সঙ্ বা জ্যাজ বা ব্লুজ-এর কিছু কিসিম জানে—সেটাই সে নিয়ে যাচ্ছে চিরকাল—একই জিনিস। আমি কলকাতার এক নম্বর হিসেবে পরিচিত গিটার-শিল্পী বা শিল্পীদের কথা বলছি। একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেখানে আমরা প্রায় বুড়ো সবাই। আমি একটু বয়স্ক। জ্ঞান সিং বেস বাজাচ্ছেন—আমার অনেককালের বন্ধু। অমিত দত্ত বাজাচ্ছেন লিড গিটার, আর নন্দন বাজাচ্ছেন ড্রাম্স্, একটা পরিচিত গান দিয়ে শুরু করব—'অ্যায় দিল, মুশকিল হ্যায় জিনা ইঁহা।'—নন্দন বললেন, হ্যাঁ, বাজিয়ে দেব, কিন্তু অন্যেরা বললেন, 'না পারব না, জানি না গানটা'। আমি বললাম, 'আরে গাইছি শুনে শুনে বাজা না।' 'না, গুরু পারব না, হবে না।' কী বলব বলো তো!

সু : তাহলে কি এটাই বলবে?

সুমন : শেষ হয়ে গেছে। একেবারেই কিছু নেই, সব শেষ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। এই ধরো আমাদের বিল্ব—পুরো নামটা জানি না, আই পি টি এ-তে বাজাত, বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গেই ও বাঁশি বাজায়, বাঁশিবাদক। শহরতলির ছেলে। এখন কথা হচ্ছে বিল্ব যদি থাকে, ওকে যে-কোনো গানের সঙ্গেই বলো, ও কিন্তু ঠিক বাজিয়ে দেবে। ওর কিন্তু কোনো কায়দা-কানুন নেই, চালাকি-টালাকি নেই। বিল্ব তো নিজের নামটা বিল্ওয়া করে দেয়নি, ও তো বিল্বই থেকে গেছে। আমার-ই মতো বুড়ো। একবার একটা অনুষ্ঠানে বিল্ব এসেছিল, আমি গাইছিলাম। শুভেন্দু মাইতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানটা ছিল। বিল্ব বাজাচ্ছিল। আমি বললাম বিল্ব, আয় আমার সঙ্গে বাজা, ও বলল, হ্যাঁ বাজাচ্ছি। 'পেটকাটি চাঁদিয়াল' গাইছি। আমি ছেড়ে দিলাম মাঝখানে ও কিন্তু বাজিয়ে দিল। সুন্দর বাজাল। সুন্দর একটা ইন্টারল্যুড করেছিল।

সু : আপনি আপনার সং রাইটার কাউকে দেখছেন না?

সুমন : না, আমার কোনো সং রাইটার নেই। সং রাইটার বলতে আমি শুধু 'গীতিকার' বলছি না। কথা এবং সুর দুটো ধরে বলছি। আমি কিন্তু আধুনিক বাংলা গানের কথা বলছি। স্থায়ী-সঞ্চারী—এসব নিয়ে আধুনিক গানের যে ফর্ম্যাটটা রয়েছে, এমন তো হতেই পারে, যে এই ফর্ম্যাটটাই থাকল না, অন্য জিনিস হয়ে উঠল। হতেও তো পারে। কিন্তু সেই পথের কে-যে পথিক হয়ে উঠবেন, মানুষ তাঁকে কীভাবে নেবেন আমি বুঝি না। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা গানের অনেক মহারথীরা, সলিল চৌধুরীর কথা বলতে পারো, এঁরা স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী, দিয়ে গড়া ফর্ম্যাট বা ধাঁচাটা তৈরি করে দিয়েছেন। এর মধ্যে ধরো সঞ্চারী না থাকতে পারে, রবীন্দ্রনাথের কত গানেই তো সঞ্চারী নেই—'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে'—সঞ্চারী তিনি রাখেননি, বা কোথাও দু'বার রেখেছেন। এরকম তো হতেই পারে। সে যাই হোক, মাথা-মুণ্ডু একটা তো ধাঁচা থাকবে আধুনিক বাংলা গানের। না, এমন আমি কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না, একজনকেও না।

সু : সুমনদা আপনি এই যে প্রথাগতভাবে আধুনিক বাংলা গানের গীতিকার-সুরকারদের কথা বললেন, আমি এই সময়ের দু-একজন সংগীতকার সম্পর্কে জানতে চাইব আপনার মত। আপনি অবশ্য চাইলে মন্তব্য নাও করতে পারেন। একজন হলেন শিলাজিৎ...

সুমন : না-না-না, সংগীত এবং শিলাজিৎবাবু—এ দুটোকে নিয়ে আমি কোনো কথাই বলব না। কোনো কথাই বলব না।

সু : চন্দ্রবিন্দু?

সুমন : চন্দ্রবিন্দু, আসলে তোমরা এটাকে ব্যান্ড বলছ, আমি এটাকে 'বৃন্দ' সংগীত বলেই মনে করছি। চন্দ্রবিন্দুর কিছু কিছু গানের কথায় খুব স্মার্ট একটা ব্যাপার এসেছিল। নাগরিক স্মার্টনেস এবং খুব হিউমারাস্ একটা ব্যাপার এসেছিল। ওই হিউমারটা, মজাটা আমি ওদের গানে খুব পেতাম। একবার একটা টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে উপলের কণ্ঠে সাত মাত্রার একটা গান শুনেছিলাম। উপল গাইল। আমার গানটা মনে পড়ছে না। আমার গান শুনে মনে হয়েছিল সিরিয়াস পারস্যুট অফ মিউজিক ইজ নট দেয়ার। সিরিয়াস পারসুট নেই! কিন্তু কিছু ইন্টেলিজেন্ট মজাদার ব্যাপার-স্যাপার ওদের গানে আছে। নিশ্চয়, ওরকম গানের প্রয়োজন আছে। সব গান একইরকম হবে এটা কাম্য নয়। কিন্তু

অন্যান্যদের যে ব্যান্ড, আমার বার-বার মনে হয়েছে, এগুলো কী হচ্ছে, কী হচ্ছে? শুধু এখানেই নয়, আমি বাংলাদেশের কথাও বলছি। আমি কিন্তু বলছি না সবাইকে দারুণ একটা গাইতে হবে, অমুকের মতোই গাইতে হবে সে কথা বলছি না। কিন্তু নতুন উচ্চারণ নেই। 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র কথাটা ধরো। মহীনের ঘোড়াগুলি বলে যেগুলো চলে, সেগুলি কিন্তু ওদের নয়। বা সবগুলো ওদের নয়। ওদের নামে পরে ওগুলো চাপানো হয়েছে। বোধ হয় 'ভারতী রেকর্ডস'-এর একটা রেকর্ড বেরিয়েছিল মহীনের ঘোড়াগুলি। সেই সময় আমার 'নাগরিক' কাজ করছিল। বিনয় ঘোষ বলতেন তোমরা একসঙ্গে বোসো। সেটা আর হল না। অর্থাৎ যে সময় আমি 'ভালো লাগছে না অসহ্য এই দিনকাল' করছি, তখন মহীনের ঘোড়াগুলিও গাইছে 'ভালো লাগে ডিঙি নৌকায় চড়ে ভাসতে' ওই ধরনের গান। যাই হোক, মহীনের ঘোড়াগুলি যে-কাজগুলো করেছিলেন, সেগুলো বেসিক্যালি ব্রিটিশ পপ্ সঙ্ বা আমেরিকান পপ্ সঙ-এর একটা বিশেষ ধারার মতো করে বাংলা কথা বসিয়ে আধুনিক ও সমকালীন করে তোলার চেষ্টা। কিন্তু ধরো 'জিঙ্গা' নামে একটা গোষ্ঠী 'জিঙ্গা শিল্পী গোষ্ঠী' বাংলাদেশে ছিল অনেকদিন আগে। এরা একটা ফ্যামিলি, ওদের একটা গান—'তুমি যখন আমাকে ফোন করলে/আমি তখন বাথরুমে'—এখন ধরো 'টেলিফোন' শব্দটা বা 'বাথরুম' শব্দটা আছে বলেই সেটাকে 'আধুনিক' বলতে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই। আজ থেকে ৫০ বছর আগে হিন্দিতে একটা গান ছিল মহিলা-কণ্ঠে সেটাতে আমার স্বামী বা সাঁইয়া রেঙ্গুন গেছে, আমাকে রেঙ্গুন থেকে টেলিফোন করেছে—এই নিয়ে একটা গান ছিল। যেটাতে 'টেলিফোন' এবং 'রেঙ্গুন' শব্দ দুটো ছিল। এখন ওই দুটো শব্দ থাকলেই, সেটা কি 'সুপার আধুনিক' গান হবে? তাহলে তো যশোদাদুলাল মণ্ডলের 'ক্যালকাটা নাইনটিন ফরটি থ্রি অক্টোবর'—এটাও তো সুপার আধুনিক হয়ে উঠত, তা তো না! আর সবচেয়ে বড়ো কথা সিরিয়াসনেস অফ পারপাস দিয়ে বডি অফ মিউজিক তৈরি করা, না হলে তোমায় মানব কেন? লেগে থাকতে হবে, পেশায় আসতে হবে। যেন রেকর্ড করে অন্যরা। পাশ্চাত্যে ধরো বব ডিলান বা অন্য কারও কারও গান, কত মানুষ গেয়েছেন, রেকর্ড করেছেন। এরকম অনেক অনেক উদাহরণ পাশ্চাত্যে আছে। আর এগুলো না হলে স্বাস্থ্যকর আদানপ্রদান মিউজিকের—সেটা হয় না। যেমন একটা কথা বলি

অভিজ্ঞতা থেকে, আমেরিকাতে একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম সম্ভবত নিউ ইয়র্কে ওই উদ্বাস্তুদের ত্রাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কনসার্টে। উদ্যোক্তা ছিলেন রবিশংকর এবং জর্জ হ্যারিসন। রবিশংকর, আলি আকবর এবং আল্লারাখাকে বাজিয়েছিলেন। আধুনিক গানের দিনে বব ডিলান এলেন, তিনি গাইলেন দুই বা তিনটি গান। কিন্তু তিনি যখন গাইছিলেন জর্জ হ্যারিসন, কেন্ রাসেল তাঁর সঙ্গে গিটার বাজাচ্ছেন। কী সুন্দর বাজাচ্ছেন, ছোটো ছোটো কিন্তু অত্যন্ত ইনপর্ট্যান্ট অ্যাডিশনও হচ্ছে। কী ভালো লেগেছিল। এবার ভাবো বাংলায় যখন আমি আর অঞ্জন কোথাও বাজাচ্ছি একসঙ্গে। আমি যেটা গাইব অঞ্জন সেটা তো আর বাজাতে পারছে না। সেই মিউজিকটাই তো নেই। আমি কোনো রাগ বা বিদ্বেষ থেকে একথা বলছি না, খেদ থেকে বলছি। যে অনুষ্ঠানটাতে গানওলার সঙ্গে অমিত দত্ত বাজাতে পারলেন না, ধরো 'ও গানওলা আর একটা গান গাও' এটার পরে 'ছেলেবেলার সেই'-এর মাঝে একটা কিছু বাজিয়ে দাও না, কিছুই বাজাতে পারলেন না। আরে কিছু না—ড্ ড্ ড্ ড্-ড্ ড্ ড্ ড্—ওই দোতারার মতো করে বাজিয়ে দাও। সেটাও বাজাতে পারছে না। কিছুই শোনেনি তো এরা। বোধই নেই। অথচ আমি একাধিক ব্রিটিশ বা লাতিন আমেরিকান মানুষদের সঙ্গে কাজ করেছি। আমি একটা সময় আন্তর্জাতিক ভারচুয়াল অপেরাতে ছিলাম। আমার সঙ্গে বাজাচ্ছিলেন দু'জন মানুষ, পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন জার্মানির এক মানুষ, আর-একজন হ্যান্ড পারকাশন বাজাচ্ছিলেন, লাতিন আমেরিকার মানুষ। তো তারা তো আমাকে চেনেন না, গানও শোনেননি, অথচ তারা তো বাজাচ্ছেন। কী করে পারছেন?

সু : ভারচুয়াল অপেরা জিনিসটা কীরকম?

সুমন : ভার্চ অপেরা, একটা অদ্ভুত থিমের উপর হয়েছিল, eberhard schoener নামে একজন বিখ্যাত কম্পোজার এটা করেছিলেন। ডাইমনার কোম্পানি বোধ হয় এটা প্রোডিউস করেছিল। এবং সেখানে আমি অংশ নিয়েছিলাম।

সু : এটা কোন সময়ে হয়েছিল?

সুমন : এটা ২০০১ সালে হয়েছিল।

সু : ভারচুয়াল অপেরাতে কি আপনি একাই এখানে থেকে ছিলেন?

সুমন : হ্যাঁ এই উপমহাদেশ থেকে একা আমিই, তেমনি ব্রাজিলের একজন, জার্মানি থেকে একজন—এভাবে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে।

সু : তাহলে কমিউনিকেশনটা হয় কীভাবে?

সুমন : কমিউনিকেশনটা হয় ইন্টারনেটে, অপেরা কোম্পানির ইন্টারনেটেই। eberhard schoener আমার গান এবং প্রেজেন্টশন শোনেন জার্মানিতে। বার্লিনের প্রাচীর ভাঙার দশম বর্ষপূর্তির একটা বিরাট অনুষ্ঠান হয়েছিল। আমাকে সেখানে বাংলা ভাষার পক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি ভাষার পাঁচজন কম্পোজারকে ডাকা হয়েছিল। তা, বাংলা ভাষার পক্ষ থেকে বাংলার একটা ১২/১৩ মিনিটের গান মানে ব্যালাড-জাতীয় গান তৈরি করতে হয়েছিল আমাকে। ওই ইতিহাসটার ওপর ব্যালাড। সেইখানে আমার গান শোনে eberhard schoener। তা তিনি আমার গান শুনে, প্রেজেন্টেশন দেখে আমাকে অফার করেন তাঁর একটি অপেরাতে কাজ করার। আমি রাজি হই। কাজটা কলকাতাতেই করা যাবে। আমাকে উনি জার্মানিতে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় ও নানা কারণে শেষ পর্যন্ত আমি জার্মানিতে যেতে পারিনি। কলকাতাতেই কাজটা করি, আমি যখন 'করেছি সন্ধান একা একা কত' এই গানটা গাইছি, আমার সঙ্গে বাজাচ্ছেন জার্মানির একজন পিয়ানিস্ট। তো কীভাবে বাজাচ্ছিলেন তিনি? আসলে শিক্ষা, শিক্ষা। সংগীত শিক্ষাটা যদি শুধু পপ্ হয় কিংবা যদি শুধুই ক্ল্যাসিক্যাল হয় তাহলে ওইরকমই হবে। ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতওয়ালারা যখন 'জনগণমন অধিনায়ক' গাইছেন বড়ো বড়ো সংগীত পণ্ডিতরা গাইছেন, তারা গলা কাঁপিয়ে পাঞ্জা...আ...আ...ব ও সিন্ধু..., ইয়ার্কি মারার জায়গা পাওনি! এখানেও তোমার গলার কাজ দেখাতে হবে! তোমার তো জেল হবার কথা। ওটা নির্দিষ্ট সুরে নির্দিষ্ট লয়ে নির্দিষ্ট সময়ে গাইতে হবে। কাজ ছাড়া, গলা কাঁপানো ছাড়া এঁরা আর কিছু পারেন না। এঁরা হচ্ছেন 'কেলাসিক্যাল গবেট', আর এখানে চারপাশে সব 'পপ্-গবেট'। মানে সংগীতটা আর রইল না। ওই কেলাসিক্যাল গবেট, পপ গবেট, জ্যাজ্ গবেটেই চারদিক ভরতি। আর কিছু না, ভাবলে খুব কষ্ট হয়। আমার নিজের ইচ্ছা করে কারও সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে, ইচ্ছে করে বাজাতে। কিন্তু কার সঙ্গে করব, কেউ নেই তো।

সু : বাংলা আধুনিক গানের সময়টা আপনি কোন্ সময় থেকে ধরবেন? যূথিকা রায়ের কণ্ঠে 'সাঁঝের তারকা' মানে, একশো বছর?

সুমন : না, না। রবীন্দ্রনাথ, অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ থেকে। আমাদের আধুনিকতাটা এখন বড়ো অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। শোনাটাই তো হচ্ছে আসল। শোনাটাতেই তো গলদ থেকে যাচ্ছে। তুমি যদি ব্যাঁকা উচ্চারণ শুনে শুনে বড়ো হও, তোমার মেয়ে যদি বাবা-মায়ের মুখে সঠিক উচ্চারণটা না শিখে ওই এফ.এম-এর বাণীগুলো শুনে-শুনে বড়ো হতে থাকে, তাহলে কী শিখবে সে? এফ. এম চ্যানেলগুলোতে হিন্দি-বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে যে-জিনিসটা চলছে, কী ভয়াবহ ভাবো সুপ্রিয়। এরা আসলে কী চাইছেন?

সু : জানি না আমরা কোন্ চূড়ান্ত অশিক্ষার দিকে চলেছি। আমরাই সেখানে ব্যাকডেটেড হয়ে পড়ছি বোধ হয়।

সুমন : ঠিক বলেছ সুপ্রিয়, আমরা তো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী! বুঝি না এসব। ভাবলে শুধু কষ্ট পাই। খুব কষ্ট পাই।

[১]অনুষ্টুপ-এর পক্ষ থেকে কবীর সুমনের এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সুপ্রিয় রায়। কবীর সুমনের বাড়িতে এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। তারিখটি ছিল ১৭ জুলাই ২০১৪।